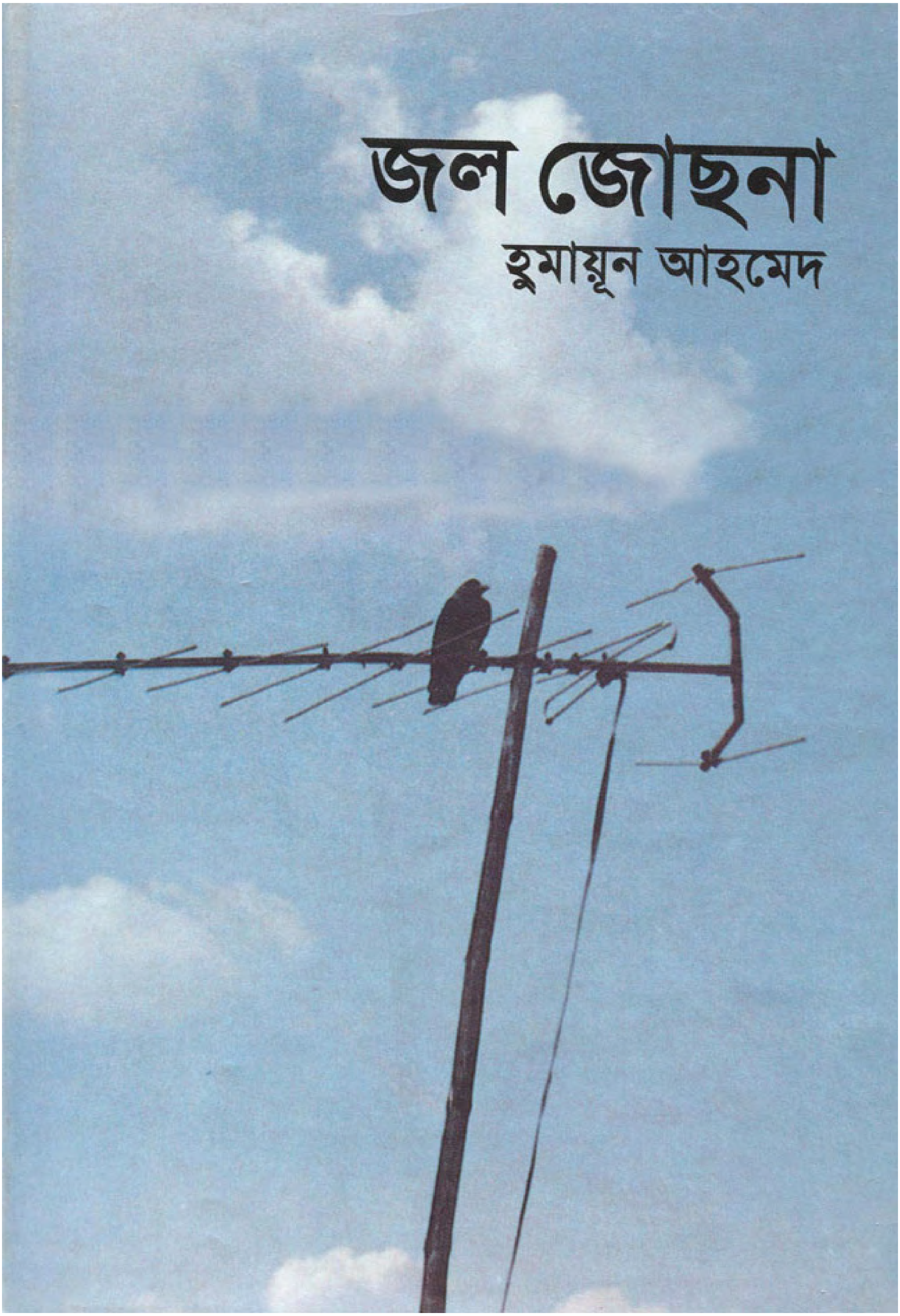
জল জোছনা
হুমায়ূন আহমেদ

©
লেখক

অষ্টম মুদ্রণ	:	এপ্রিল	২০০৬
সপ্তম মুদ্রণ	:	জুন	২০০২
ষষ্ঠ মুদ্রণ	:	জানুয়ারি	২০০০
পঞ্চম মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি	১৯৯৮
চতুর্থ মুদ্রণ	:	সেপ্টেম্বর	১৯৯৬
তৃতীয় মুদ্রণ	:	জানুয়ারি	১৯৯৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	জুলাই	১৯৯৩
প্রথম প্রকাশ	:	জুন	১৯৯৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ISBN-984-495-007-4

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থা নয়াবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। অক্ষর বিন্যাস দীপ্তি কম্পিউটারস ৩৮/২খ বাংলাবাজার ঢাকা।

উৎসর্গ

সমরেশ মজুমদার
একজন বড় মাপের মানুষ।

ভূমিকা

ঈদ সংখ্যা বিচিত্রায় এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থবদ্ধ করার আগে বেশকিছু রদবদল করা হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল প্রখর সূর্যালোকে জোছনার গল্প বলব। চেষ্টা করেছি প্রাণপণ। কতটা পারলাম বুঝতে পারছি না।

হুমায়ূন আহমেদ
নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।
১লা বৈশাখ ১৪০০ সাল

তিনি ঘুমের মধ্যে শুনলেন — শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। ঘুমের মধ্যেও চেতনার খানিকটা অংশ কাজ করে। সেই অংশ তাঁকে বলল, তুমি স্বপ্ন দেখছ। ভয় পাবার কিছু নেই। আরেকটি অংশ বলল, না, স্বপ্ন না। ঝড় হচ্ছে। তুমি জেগে ওঠ। জানালা বন্ধ কর। সাইড টেবিলের ড্রয়ারে টর্চলাইট আছে কি-না দেখ।

তিনি জাগলেন না। ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরলেন। শোঁ শোঁ শব্দ হতেই থাকল। এক সময় এই শব্দের সঙ্গে খিলখিল হাসির শব্দ যুক্ত হল। ঝড় এবং হাসি একসঙ্গে যায় না। কিছু-একটা হচ্ছে যা তিনি বা তাঁর মস্তিষ্কের ঘুমন্ত অংশ ধরতে পারছে না। তাঁর অস্বস্তি বাড়ল। তিনি জেগে উঠলেন।

ঝড়-টড় কিছু না। বাথরুমে তাঁর স্ত্রী রেবেকা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোচ্ছেন। শোঁ শোঁ শব্দ আসছে হেয়ার ড্রয়ার থেকে। রেবেকার পাশে তাঁর বড় মেয়ে নীতু। সম্ভবত সে-ই হাসছে। তিনি বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়ি বের করলেন। রাত সাড়ে তিনটা। এই সময়ে কেউ হেয়ার ড্রায়ারে চুল শুকায়? কি হচ্ছে? না-কি এখনো তিনি স্বপ্নের মধ্যেই আছেন? মানুষের স্বপ্ন মাঝে মাঝে খুব জটিল এবং খাপছাড়া হয়ে থাকে।

তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, আর তখনি রাত সাড়ে তিনটায় রেবেকার চুল শুকানোর রহস্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হল। বাড়ির সবাই আজ বেড়াতে যাচ্ছে। শেষ রাতে রওনা হবার কথা, গন্তব্য দিনাজপুর। থাকবে রামসাগরে ফরেস্টের ডাকবাংলোয়। ঐ ডাকবাংলোই তাঁদের 'বেস পয়েন্ট।' এখান থেকে নানান জায়গায় ঘুরবে। কোথায় কোথায় যাবে বা কতদিন থাকবে তিনি কিছুই জানেন না। তাঁকে বলাও হয়নি। কেউ প্রয়োজন বোধ করেনি। একটা সময় আসে যখন সংসারের কাছে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তাঁরও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

তিনি বিছানা থেকে নামলেন। নিঃশব্দে নামতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। সাইড টেবিলে হাত লাগল। পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখা পানির গ্লাস গড়িয়ে পড়ল। মেঝেতে পড়ার আগেই তিনি ক্রিকেট বল ক্যাচ করার মত গ্লাস ধরে ফেললেন। তাঁর ভাল লাগল। পঞ্চাশ বছর বয়সেও **Reflex action** ঠিক আছে। রাত সাড়ে

তিনটায় মৃতীর মত চুপচাপ বিছানায় বসে থাকার কোন মানে হয় না। তিনি বিছানা থেকে নামলেন।

রেবেকা বাথরুম থেকে বের হয়ে এলেন। রেবেকার পেছনে পেছনে এল নীতু। রেবেকা বললেন, সরি, তোমার ঘুম ভাঙিয়ে ফেললাম।

'তোমরা ভাঙাওনি। এইসময় এম্নিতেই আমার ঘুম ভাঙে।'

মনজুর স্ত্রীর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকালেন। রেবেকা সুন্দর করে সেজেছে। সবুজ রঙের শাড়ি। গলায় সবুজ পাথরের হার। সবুজ পাথরগুলোকে কি বলে — পান্না না ফিরোজা? রেবেকার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তাকে দেখে কে বলবে? পঁচিশ–ছাব্বিশ বছরের ঝকঝকে তরুণীর মত লাগছে। মনজুর হাসিমুখে বললেন, তোমরা কি রাত একটা থেকেই সাজসজ্জা করছ?

রেবেকা জবাব দিলেন না। জবাব দিল নীতু। সে আনন্দিত গলায় বলল, আমরা দু'টা থেকে রেডি হচ্ছি। সূর্য ওঠার আগে রওনা হব তো, এই জন্যেই এত তাড়া। আমরা সকালের নাশতা কোথায় খাব জান বাবা? আমরা সকালের নাশতা খাব জাতীয় স্মৃতিসৌধে। সুন্দর আইডিয়া না?

'সুন্দর আইডিয়া। জায়গাটা কি খুব প্যানারোমিক?'

নীতু বিস্মিত গলায় বলল, তুমি জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখনি?

'কাছে গিয়ে দেখিনি। আরিচা রোড ধরে যাবার সময় দূর থেকে দেখেছি।'

রেবেকা বললেন, তোর বাবা তাঁর অফিস এবং সিঙ্গাপুর, ব্যাংককের অফিস ছাড়া কিছু দেখেনি। ব্যবসা দেখতে দেখতেই তার সময় চলে যায়, আর কি দেখবে?

মনজুর সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিতে নিতে বললেন, সবাই সবকিছু এনজয়ও করে না। গাছপালা, জঙ্গল এইসব আমাকে ঠিক এটাক্ট করে না। রেবেকা, আমি ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাব। কাউকে বল বরফ দিয়ে আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে।

রেবেকা নিজেই পানি আনতে গেলেন। নীতু বলল, স্মৃতিসৌধের বাগানে বসে ব্রেক ফাস্টের আইডিয়া তোমার কাছে কেমন লাগছে বাবা?

'খুব সুন্দর আইডিয়া। কার আইডিয়া, তোর মা'র?'

'না। জহির চাচার।'

'সেও যাচ্ছে না কি?'

'হ্যাঁ।'

রেবেকা পানি নিয়ে এসেছেন। তিনি পানির গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। গ্লাসে দু'টুকরা বরফ ভাসছে। মনজুর গ্লাস হাতে নিলেন, কিন্তু চুমুক দিলেন না। বরফের

টুকরা দু'টি গলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ফ্রীজের বোতলে রাখা ঠাণ্ডা পানি তিনি খেতে পারেন না। বেশি ঠাণ্ডা লাগে। তাঁর নিয়ম হচ্ছে, সাধারণ এক গ্লাস পানিতে দু'টুকরা বরফ মিশিয়ে নেয়া।

রেবেকা নীতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই দেরি করছিস কেন? শাড়ি পরবি বলছিলি, পরে ফেল। তোর ঘরে সব রেখে এসেছি।

'কমলা রঙের শাড়ি পরব না মা। চোখে কট্ কট্ করে। আমিও তোমার মত সবুজ পরব। হয় সবুজ, নয় নীল।'

'তুই কমলাটাই পরবি। এক এক বয়সের জন্য এক এক শাড়ি। তোর বয়সী মেয়েদের শাড়ি হল — কমলা এবং লাল।'

'আমার চেয়ে কম বয়েসীদের কি শাড়ি মা?'

'ওদের জন্যে গোলাপী।'

'আমার ইচ্ছা করছে তোমার মত সবুজ শাড়ি পরতে।'

'তোকে যা পরতে বলেছি তাই পর।'

নীতু শাড়ি পরতে গেল। খুব আগ্রহ নিয়ে গেল তা মনে হল না। মনজুর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে সুন্দর লাগছে।

রেবেকা বললেন, থ্যাংকস।

'সবুজ শাড়িতে খুব মানিয়েছে। নীতু সবুজ পরতে চাচ্ছে, পরুক। আমার মনে হয় ওকেও মানাবে।'

'এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মনজুর পানি শেষ করলেন। চারটা প্রায় বাজতে চলেছে। আরো ঘণ্টাখানিক ঘুমানো যায়। ঘুম আসবে কি-না সেটাই হল কথা। পঞ্চাশ পার-হওয়া মানুষদের ঘুম একবার ভেঙে গেলে আর আসে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করাই সার হয়। তিনি শুয়ে পড়লেন। শীত শীত লাগছে। কার্তিক মাস। শেষ রাতের দিকে শীত-শীত করে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যান বন্ধ করলে হয়ত গরম লাগবে। তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, জহির যাচ্ছে শুনলাম।

'হ্যাঁ যাচ্ছে। তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

'আপত্তি থাকবে কেন?'

রেবেকা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তোমার প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হচ্ছে আপত্তি আছে। আপত্তি থাকলে বল।

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বললেন, আমি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছি।

'না করনি। তুমি কোন কিছু নিয়েই প্রশ্ন কর না। আজ হঠাৎ জানতে চাচ্ছ

জহির সঙ্গে যাচ্ছে কি–না, এর মানে কি?'

'কোন মানে নেই রেবেকা।'

'সে যে মাঝে মধ্যে এ বাড়িতে আসে, আমাদের এখানে–ওখানে বেড়াতে নিয়ে যায়, সে বিষয়ে তোমার কি কিছু বলার আছে?'

মনজুর গম্ভীর গলায় বললেন, আছে।

'বলে ফেল।'

'সে যা করে তার জন্যে আমার তাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। ওর সঙ্গে দেখা হয় না বলে ধন্যবাদ দেয়া হয় না। আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। তোমাদের কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় না। জহির এই দায়িত্ব পালন করে। সো নাইস অব হিম।'

'সেটা আমাকে না বলে তাকেও তো বলতে পার।'

'বলব, দেখা হলেই বলব। দেখাই হয় না। রেবেকা, ফ্যানটা অফ করে দিয়ে যাও — ঠাণ্ডা লাগছে।'

রেবেকা ফ্যান অফ করলেন। মনজুর পাশ ফিরে শুলেন। বাথরুমে বাতি জ্বলছে। বাতি না নেভা পর্যন্ত ঘুম আসবে না। বাতি নেভানোর কথা রেবেকাকে বলতে পারছেন না। কোথাও বেড়াতে যাবার আগে মেয়েরা দীর্ঘ সময় বাথরুমে থাকতে পছন্দ করে। তাঁর ধারণা, প্রয়োজন ছাড়াই তারা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

রেবেকা তা করলেন না। বাথরুমের বাতি নেভালেন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মনজুর জড়ানো গলায় বললেন, গুড নাইট। বলেই মনে হল — কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হচ্ছে — এখন বোধহয় গুড নাইট বলা ঠিক হল না। 'বনভয়াজ' বলা যেত।

রেবেকা বললেন, যাচ্ছি, কেমন? টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখে গেলাম। ফ্রীজের গায়ে মেগনেট দিয়ে আটকানো। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবে। অবশ্যি জানি, প্রয়োজন পড়বে না। তবু নাম্বার রইল।

মনজুর জবাব দিলেন না। রেবেকা ইদানীং কাটা–কাটা ভঙ্গিতে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সহজভাবে কিছুই বলতে পারে না। চুপচাপ থাকাই ভাল। শুয়ে থাকাও অর্থহীন। ঘুম আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না। দু'টা পাঁচ মিলিগ্রামের ফ্রিজিয়াম খেয়ে ঘুমুতে গিয়েছিলেন। এর প্রভাবে ভোর দশটা পর্যন্ত থাকার কথা না। রেবেকা ঘর থেকে বের হবার পর পরই তিনি বিছানা ছাড়লেন। চোখে–মুখে পানি দিলেন। আয়নায় নিজেকে কুৎসিত লাগছে। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি। তাঁর মাথার চুল এখনো কালো, কিন্তু দাড়ি–গোঁফ পেকে শাদা হয়ে গেছে। এরকম হওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত? তাঁর আঠারো বছর বয়সে দাড়ি–গোঁফ গজাল। কাজেই

মাথার চুলের চেয়ে এদের বয়স আঠারো বছর কম। চুল পাকারও আঠারো বছর পর দাড়ি-গোঁফ পাকার কথা।

তিনি খানিকক্ষণ গালে হাত বুলালেন। চট করে শেভ করে ফেললে হয়। ইচ্ছা করছে না। তিনি বাথরুমের বড় টাওয়েলটা গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে এলেন। নীতুকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কমলা রঙের শাড়িতে তাঁর আঠারো বছরের মেয়েটাকে কেমন দেখাচ্ছে? বেচারীর শখ ছিল সবুজ শাড়ির। মা'র মত হতে চাচ্ছিল। মেয়েটা তার মায়ের মা'র মত রূপবতী হয়নি। গায়ের রঙ হয়েছে কালো। নীতুর মনে এ নিয়ে গোপন কষ্ট আছে। তিনি তা জানেন। গোপন কষ্ট থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এই দেশে কালো মেয়েদের কেউ রূপবতী বলে না।

নীতু বাবাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, বাবা, তুমি।

মনজুর সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ভূত দেখার মত চমকে উঠলি যে! টাওয়েল গায়ে আমার বারান্দায় আসাটা কি এতই অস্বাভাবিক ব্যাপার?

'মোটেই অস্বাভাবিক না। কিন্তু আমার চমকে উঠার কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে — এই কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ করে আমার মনে হল — বাবা বের হয়ে এসে আমাকে বলবে— নীতু, আমি যাচ্ছি তোদের সাথে।'

'এটা হোল তোর উইশফুল থিংকিং।'

'তাও জানি।'

'তোকে তো কমলা রঙের শাড়িতে সুন্দর লাগছে।'

'সত্যি সুন্দর লাগছে, বাবা?'

'হ্যাঁ সুন্দর। যেই দেখবে সেই বলবে, সুন্দর।'

'জহির চাচা অবশ্যি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, আমাকে নাকি অবিকল জলপরীর মত লাগছে।'

'ও কি জলপরী দেখেছে আগে?'

নীতু খিলখিল করে হেসে ফেলল। তিনি বিস্মিত হয়ে মেয়ের হাসি শুনলেন। এমন আনন্দময় শব্দে তিনি কাউকে হাসতে শুনেন নি। যেন রিনঝিন শব্দে একসঙ্গে অনেকগুলো রূপার নূপুর বেজে ওঠেছে।

'বাবা।'

'ইয়েস মাই লিটল ডিয়ার।'

'আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'না।'

'আগেই না বলে ফেললে কেন? তুমি তো জান না আমার অনুরোধটা কি?

আগে শুনবে, তারপর যা বলার বলবে।'

'তোর অনুরোধ কি অনুমান করতে পারছি বলেই আগেভাগে 'না' বললাম। তোর অনুরোধ হচ্ছে — আমি যেন তোদের সঙ্গে যাই।'

নীতু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, অনুরোধে কাজ হবে না। তাই না বাবা?

'না, কাজ হবে না। আমার অসংখ্য সমস্যা। এর মাঝখান থেকে বিনা নোটিশে আমি সময় বের করতে পারব না।'

'মনে কর, হঠাৎ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ।'

'আমি তো অসুস্থ হইনি।'

'মনে কর।'

'মনে করাও সম্ভব না। তাছাড়া তোরা একভাবে প্ল্যান করেছিস। আমি হঠাৎ সঙ্গে গেলে প্ল্যান গণ্ডগোল হবে।'

'তোমার সব মিথ্যা যুক্তি। আসলে তুমি যাবে না।'

'তাও ঠিক।'

নীতু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনজুর সাহেব কোমল গলায় বললেন, তোরা রওনা হচ্ছিস না কেন?

'রওনা হব। জহির চাচা রওনা হবার আগে এক কাপ কফি খেতে চাচ্ছেন। কফি তৈরি হচ্ছে।'

'জহির এসেছে না-কি?'

'হ্যাঁ এসেছেন।'

'আমাকেও কফি দিতে বল, জহিরের সঙ্গে বসেই কফি খাই।'

জহিরকে দেখাচ্ছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত। মাথায় শাদা টুপি। পরনে শাদা প্যান্ট-শার্ট। পায়ে শাদা কেডস্ জুতা। বয়সও কম লাগছে। বয়স কম লাগার রহস্যটা ধরা যাচ্ছে না। রঙচঙা শার্ট গায়ে থাকলে বয়স কম লাগার একটা যুক্তি দাঁড়া করানো যেত। পায়ে কেডস্ জুতা এবং মাথার টুপি একটা কারণ হতে পারে।

জহির মনজুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যালো গ্রেট ম্যান। গুড মর্নিং।

মজনুর হাসলেন।

জহির বললেন, তোকে মিশরের মমীর মত লাগছে কেন রে?

'মিশরের মমীর মত লাগছে না-কি?'

'অবিকল মিশরের মমী। গায়ে তোয়ালে থাকায় মমীর ইলিউশানটা আরো জোরালো হয়েছে।'

'মমীদের গায়ে তোয়ালে থাকে?'

'কাঁধে চাদরের মত একটা কি-যেন থাকে।'

মনজুর হাই তুললেন। জহির বললেন, তুই কি এই সময়েই উঠিস না আজ ঘুম ভেঙেছে?

'আজ ভেঙেছে।'

জহির হাসতে হাসতে বললেন, এরা তোর ঘুম ভাঙিয়েছে। এদের সাহস তো কম না। কোটিপতির ঘুম ভাঙানো!

'তোরা রেডি?'

'ইয়েস স্যার। গাড়িতে মালপত্র তোলা হয়েছে। আমি কফির জন্যে অপেক্ষা করছি। কফিতে গুনে গুনে তেরটা চুমুক দিয়ে গাড়িতে উঠব।'

'তের চুমুক কেন?'

'বিষে বিষক্ষয়। যাত্রার আগে তেরবার কোন একটা কাজ করলে যাত্রার দোষ নাস্তি হয়ে যায়।'

'এই তথ্য পেয়েছিস কোথায়?'

'এটা হল জিপসি কালচার। জিপসিরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও যাবার আগে এরা তেরোবার মদের গ্লাসে চুমুক দেয়। তুই আছিস কেমন বল। তোর সঙ্গে তো দেখাই হয় না। বাজারে গুজব — তুই না কি জাহাজ কিনছিস? **Sea going Vessel.**

'ভাবছি। এখনো প্ল্যানিং পর্যায়ে।'

'যদি সত্যি সত্যি জাহাজ কিনে ফেলিস তাহলে জাহাজের নামটা আমাকে রাখতে দিস। স্কুল জীবনের দরিদ্র বন্ধুর এই একটা অনুরোধ। তুই কিনবি জাহাজ — আমি রাখব নাম।'

'কি নাম?'

'জল-জোছনা। খুব কাব্যিক নাম না?'

'হুঁ।'

'আমার সেকেন্ড রিকোয়েস্ট হচ্ছে — কোন এক জোছনা রাতে তুই তোর ঐ জাহাজে করে আমাকে সমুদ্র দেখিয়ে আনবি, পারবি?'

'পারব।'

'তোর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে রাখবি, ফুল-মুন আকাশের মাঝামাঝি যখন আসবে তখন সে যেন জাহাজের ইনজিন বন্ধ করে দেয় এবং জাহাজের সব বাতি নিভিয়ে দেয়।'

'আচ্ছা বলে দেব।'

'আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াস।'

'আমিও সিরিয়াস।'

কফি নিয়ে রেবেকা ঢুকলেন। জহির উজ্জ্বল মুখে বললেন, রেবেকা, গুড নিউজ তোমার কোটিপতি স্বামী তার জাহাজের নাম জল-জোছনা রাখতে রাজি হয়েছে বলে মনে হয়।

রেবেকা বললেন, তাড়াতাড়ি কফি শেষ কর। সূর্য ওঠার আগে আমাদের রওনা হবার কথা।

জহির বললেন, সূর্য ওঠার আগে আমাদের রওনা হওয়া যাবে না। আমাদের রওনা হতে হবে সূর্য উদয়ের পর। অন্ধকারে গৃহত্যাগ করতে নেই। জিপসীরা কখনো অন্ধকারে ঘর ছাড়ে না।'

'তুমি কি জিপসী?'

জহির কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, যখন আমি ঘরে থাকি তখন গৃহী যখন পথে নামি তখন আমি জিপসী।

A bag of flower
Spider full of can
Truth is meaningless
To a Gypsy man.

মনজুর কফির কাপ নামিয়ে রাখলেন। অতিরিক্ত চিনি দেয়া হয়েছে। সমস্ত মুখ মিষ্টি হয়ে আছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। জহির বলল, চলে যাচ্ছিস?

'হুঁ।'

'এখন কি করবি, আবার বিছানায় শুয়ে পড়বি?'

'বলতে পারছি না। তবে শুয়ে পড়তেও পারি। আমি তো আর জিপসীম্যান না। আমি সাধারণ মানুষ।'

'তুই কিন্তু আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস। আমরা রামসাগরে জোছনা দেখব। আগামীকাল পূর্ণিমা।'

'নেক্সট টাইম। বনভয়াজ।'

বারান্দায় নীতুর সঙ্গে আবার দেখা। সে রেলিং-এ হেলান দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। মেয়েটাকে কমলা শাড়িতে ভাল দেখাচ্ছে না। তিনি মিথ্যা করে বলছেন, সুন্দর। শরীরের সৌন্দর্য যেভাবে দেখা যায় মনের সৌন্দর্য সেভাবে দেখা গেলে খুব ভাল হত। তাহলে নীতুকে অবশ্যই জলকন্যার মত লাগত।

নীতু বলল, তুমি ভাল থেকো, বাবা।

'ভাল থাকব মা।'

'আরেকটা কথা — আগামীকাল রাত ঠিক একটার সময় তুমি যেখানেই থাক আকাশের চাঁদের দিকে তাকাবে।'

'কেন?'

'ঐ সময় আমিও রায়সাগর থেকে চাঁদের দিকে তাকাব। এবং মনে মনে ভাবব তুমিও তাকাচ্ছ। মনে থাকবে বাবা?'

মনজুর সাহেব জবাব দিলেন না। নীতু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চুপ করে আছো কেন? পারবে না?

তিনি বললেন — রফিককে বল আমার ব্যাগ গুছিয়ে গাড়িতে নিয়ে তুলতে। আমি যাচ্ছি তোদের সঙ্গে।

নীতু কয়েক সেকেন্ড যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর আঠারো বছরের মেয়ে সাত বছরের বালিকার মত কাঁদছে।

রেবেকা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, কি হয়েছে?

মনজুর অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, কিছু হয়নি।

'নীতু কাঁদছে কেন?'

'আনন্দে কাঁদছে।'

'কিসের এত আনন্দ?'

নীতু চোখ মুছতে মুছতে বলল, বাবা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, মা।

রেবেকা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কি সত্যি সত্যি যাচ্ছ?

'হ্যাঁ।'

'কেন বলতো?'

'মত বদলেছি। এখন মনে হচ্ছে ঘুরে আসি।'

'মতটা কেন বদলালে তাই জানতে চাচ্ছি।'

নীতু বলল, তুমি এত জেরা করছ কেন? বাবা যেতে চাচ্ছেন এটাই হচ্ছে বড় কথা।

মনজুর নিজের ঘরে ঢুকলেন। কিছু কাপড় জামা দ্রুত গুছিয়ে নিতে হবে। তাঁর জন্যে সবার দেরী হোক তা তিনি চান না। অফিস সেক্রেটারীকে খবর দিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। এত সকালে তাঁর ঘুম ভাঙ্গানো কি ঠিক হবে? ঠিক হবে না। ঠিক

না হলেও ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। তিনি টেলিফোন সেটের সামনে বসলেন। ছ'বার রিং হবার পর ঘুম ঘুম গলায় ওপাশ থেকে বলল, কে?

মনজুর সাহেব কিছু বলল, আগেই লাইন কেটে গেল। তিনি যতবারই টেলিফোন করছেন ততবারই ও পাশ থেকে এনগেজড টোন আসছে। রেবেকা পাশে এসে দাঁড়ালেন। মনজুর বললেন , কিছু বলবে?

'হ্যাঁ।

'বল। তুমি যে রকম মুখ গম্ভীর করে রেখেছ দেখে ভয় ভয় লাগছে।'

তুমি কি সত্যি যাচ্ছ?

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'ব্যাগ গুছাব?'

'গুছিয়ে দাও।'

রেবেকা বললেন, নীতু তোমাকে এমন কি বলেছে যে চট করে সবকাজ ফেলে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হলে?

'নীতু কিছু বলেনি। আমি নিজ থেকেই ঠিক করলাম।'

'তুমি সহজে মত বদলাও না। আমার ধারণা নীতু নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু বলেছে।'

মনজুর সাহেব হাসলেন। আবার টেলিফোনে চেষ্টা করতে লাগলেন। রেবেকা কঠিন গলায় বললেন, তুমি দয়া করে টেলিফোনের বোতাম টেপা বন্ধ কর। আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কি বলেছে নীতু।

মনজুর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নীতু বলেছে বাবা তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। ইঁদুর মারা বিষ খাব।

রেবেকা মুখ কালো করে সরে গেলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। এই পানি তিনি গোপন রাখতে চান। কাজেই স্বামীর সামনে থেকে সরে যাওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না।

বার সীটের মাইক্রোবাস। খুব ক্যায়দার গাড়ি। স্কাই লাইট আসার ব্যবস্থা আছে। বসার সিটগুলি আলাদা আলাদা — রিভলভিং। যাত্রীরা মুখোমুখি বসতে পারে। সামনে ছোট টেবিলও আছে। গাড়ির জানালায় রঙিন পর্দা। পর্দার কারণে গাড়িকে গাড়ি মনে হয় না। চলমান বাড়ি বলে মনে হয়।

এই গাড়ি গত বছর কেনা হয়েছে। তেমন ব্যবহার হয়নি। এখনো নতুন গন্ধ রয়ে গেছে। গাড়ি চালাচ্ছে ইসমাইল। সে অতি দ্রুত চালায়। আজ বড় সাহেব আছেন, তাকে খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে। বড় সাহেব সম্পর্কে তাদের ভেতর যে কথা প্রচলিত, তা হচ্ছে — বড় সাহেবকে দেখে মনে হয় তিনি কিছুই বোঝেন না, আসলে সবই বুঝেন। গাড়ি চালাতে গিয়ে সামান্য ভুল করলে তিনি কিছু বলবেন না। তাকাবেনও না। কিন্তু তাঁর ঠিকই মনে থাকবে।

ইসমাইল চেষ্টা করছে কোনরকম ঝাঁকুনি ছাড়া গাড়ি চালাতে। অনেক আগে থেকে স্পীড ব্রেকার লক্ষ্য করতে হচ্ছে। গীয়ার চেঞ্জ করতে হচ্ছে সাবধানে। নতুন গাড়ি — গীয়ার শক্ত, মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ইসমাইল অস্বস্তি বোধ করছে।

মনজুর সাহেব বললেন, ইসমাইল মিয়া!

ইসমাইলের হাত কেঁপে গেল। সে শান্ত ভঙ্গিতে বলল, জ্বি স্যার।

'তোমার ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিল?'

'জ্বি স্যার।'

'রেজাল্ট কি?'

'পাশ করেছে স্যার।'

'কোন ডিভিশন?'

'সেকেন্ড ডিভিশন।'

'আচ্ছা।'

ইসমাইল স্বাভাবিক হল। যদিও তার বিস্ময়বোধ দূর হল না। ছ'মাস আগে একবার সে স্যারকে কথায় কথায় বলেছিল ছেলের কথা। স্যার ঠিকই মনে রেখেছেন। এরকম মালিকের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে। ইসমাইল গাড়ির গতি

খানিকটা বাড়িয়ে দিল। আরিচা রোডে দ্রুত গাড়ি চালাতে হয়। একেক রোডের একেক নিয়ম।

নীতু বাবার পাশে বসেছে। সে সব সময় জানালার পাশে বসে। আজ বসেনি। বাবাকে জানালা ছেড়ে দিয়েছে। নীতুর পাশে তার মা। তারা মুখোমুখি বসতে পারত, তা বসেনি। জহির তাদের পেছনের সীটের পুরোটা দখল করে আধশোয়া হয়ে আছে। পা মেলে দিয়েছে। মাথার নিচে দু'টা বালিশ। তাঁর সঙ্গে গাদা খানিক ম্যাগাজিন। বর্তমানে একটি **'Omni'** পত্রিকা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

মনজুর বললেন, বেড়াতে এসে জহির কি সব সময় ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে থাকে, না আজই পড়ছে? প্রশ্ন করা হয়েছে রেবেকাকে। রেবেকা তার জবাব দিলেন না। জবাব দিল নীতু। সে চাপা গলায় বলল, জহির চাচা যখন যে জিনিসটা করার না সেটা করেন। বেড়াতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় তিনি ঘুমিয়ে কাটান।

জহির পেছনের সীট থেকে বললেন, ঠিক বললে না নীতু। আমি একবারই শুধু সারাদিন ঘুমিয়েছিলাম। তার কারণ হল — সারারাত জেগেছিলাম।

মনজুর বললেন, এবারো কি এরকম রাত জাগার প্রোগ্রাম আছে?

'আছে। আজ রাতটা কাটাতে হবে জেগে। কারণ আজ পূর্ণিমা। আমার হিসেব মত বিকেল পাঁচটার মধ্যে রামসাগর পৌঁছে যাব। গোসল করে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে শুরু হবে নিশিপালন।'

'খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কি?'

'সব ব্যবস্থা করা আছে। বাবুর্চি রান্না করে রাখবে। বাবুর্চির নাম মুসলেহউদ্দিন। আমার জানামতে বাঙালি রান্নায় সে পৃথিবীতে দু'নম্বর।'

নীতু বলল, এক নম্বর কে?

'এক নম্বর হলেন আমার এক চাচী। নেত্রকোনা থাকেন। একবার তোদের তাঁর রান্না খাওয়াব। তবে না খাওয়াই ভাল।'

'না খাওয়া ভাল কেন চাচা?'

'একবার উনার রান্না খেলে অন্য কোন খাবার মুখে রুচবে না। এই জন্যে না খাওয়া ভাল।'

মনজুর বললেন, তোর সেই দু'নম্বর বাবুর্চি সব রান্না-বান্না করে রাখবে?

'হ্যাঁ, করে রাখবে। তুই চাইলে কি রান্না করবে — তাও বলতে পারি।'

'কি রাঁধবে?'

'ছোট আলু দিয়ে মুরগীর ঝোল। মটর ডাল এবং গরুর গোশতের একটা প্রিপারেশন। দু'রকমের সবজি। কৈ মাছের দোপেঁয়াজা। তাকে টেলিফোনে বলে

দেয়া হয়েছে।'

রেবেকা বললেন, কি রান্না হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? যথাসময়ে খাবার পাবে। তোমার অসুবিধা হবে না।

নীতু বলল, বাবা তো কখনও আমাদের সঙ্গে যায়নি। বাবার ধারণা, আমরা অকূল সমুদ্রে পড়ব। ঠিক বলছি না বাবা?

'হ্যাঁ ঠিক। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় আমরা কয়েক বন্ধু মিলে একবার তেতুলিয়া গিয়েছিলাম। ওখানকার ডাকবাংলোয় একরাত ছিলাম। ছ'জন মানুষের জন্যে দু'টা মাত্র বিছানা। কোন বাবুর্চি ছিল না। সারারাত খিদেয় ছটফট করেছি এবং শীতে কেঁপেছি।'

'কিছুই খাওনি সারারাত?'

'ভেলি গুড় দিয়ে একগাদা করে মুড়ি খেয়েছি।'

'ভেলি গুড়টা কি?'

'ভেলি গুড় হল আখের গুড়।'

'তেতুলিয়া জায়গাটা কেমন বাবা?'

'আহামরি কিছু না। সাধারণ। বেড়াতে যাবার মত জায়গা না।'

'তোমরা গিয়েছিলে কেন?'

'আমাদের প্ল্যান ছিল টেকনাফ দেখব, তারপর তেতুলিয়া দেখব। বাংলাদেশের দুই মাথা দেখা হবে।'

'প্ল্যানটা কার? তোমার?'

'না, আমার না।'

'কার প্ল্যান বাবা?'

'মনে পড়ছে না, মা।'

জহির মুখের সামনে থেকে '**Omni**' পত্রিকা সরিয়ে নিয়ে বললেন, তোর স্মৃতিশক্তির খুব প্রশংসা শুনি। প্রমাণ পাচ্ছি না। তেতুলিয়ায় আমিও ছিলাম।

'ঠিক ঠিক। তুইও ছিলি — তেতুলিয়া যাবার আইডিয়াটাও ছিল তোর। আসলেই আমার মনে ছিল না। সরি।'

'সরি বলছিস কেন? সরি বলার কি আছে?'

'অন্যদের কথা ভুলে গেলেও তোর কথা ভোলা ঠিক হয়নি।'

জহির শান্তগলায় বললেন — আমার কথা ভুললে ক্ষতি নেই কিন্তু তেতুলিয়ায় আমরা একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম। সেটা কি তোর মনে আছে?

'তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।'

'বন্ধু-বান্ধবকে ভুলে যাওয়া অপরাধ না, কিন্তু দৃশ্যটির কথা ভুলে যাওয়া অপরাধ।'

নীতু বলল, কি দৃশ্য চাচা?

'আমি বলব না। আমি চাই তোর বাবা দৃশ্যটা মনে করবে। এবং তারপর বলবে তেতুলিয়া ভ্রমণ ছিল তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।'

নীতু বলল, বাবা, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে?'

'উঁহু।'

জহির বললেন, সেই সময় সঙ্গে কারা ছিল মনে আছে? আমার কথা বাদ দে। অন্যদের কথা কি তোর মনে আছে?'

'মনে আছে। শাহেদ ছিল। আবদুল গনি ছিল। শমসের ছিল। আরেকটা হিন্দু ছেলে ছিল। জোর করে তাকে একবার গরুর গোশত খাইয়ে দেয়া হল। চিৎকার করে কান্না। ওর নাম যেন কি?'

'সতীশ।'

'ইয়েস, সতীশ। এরা কে কোথায় জানিস?'

'অবশ্যই জানি। আমার কাজই হল বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। তোর বাসায় এসে যেমন পড়ে থাকি। ওদের বাসায়ও তাই করি। আমি হলাম একজন মডার্ন জিপসী।'

'মডার্ন জিপসীরা কি বন্ধুদের বাসায় বাসায় ঘুরে বেড়ায়?'

'মডার্ন জিপসীরা জীবিকার জন্যে কোন পরিশ্রম করে না। হেসে খেলে জীবন পার করে। বেড়াতে পছন্দ করে। তারা চায় ঝামেলামুক্ত জীবন।'

'তোর জীবন ঝামেলামুক্ত?'

'ইয়েস স্যার। বিয়ে করে খানিকটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। বেচারী তা বুঝতে পেরে চট করে মরে গেল। সেও মুক্তি পেল। আমিও পেলাম। মনজুর, আমার স্ত্রীর কথা তোর মনে আছে?'

মনজুর কিছুক্ষণ চুপ থেকে হালকা গলায় বললেন, আছে।

'মহিলা কেমন ছিল নীতুকে একটু বল তো। ও আমার কাছে প্রায়ই জানতে চায়। আমি চুপ করে থাকি, কিছু বলি না। আচ্ছা থাক, তোর কাছে ঐ মহিলার গল্প আমরা পরে শুনব। রামসাগরে জোছনা দেখতে দেখতে শুনব। সেটাই শোভন হবে, কারণ মহিলার নামও জোছনা।'

নীতু বলল, চাচা, আপনি না বলেছিলেন উনার নাম মীরা!

'তার অনেকগুলি নাম ছিল। জোছনা হচ্ছে সেই অনেক নামের এক নাম।

'উনার আর কি নাম ছিল?'

'আমি ডাকতাম — 'রামী।'

'রামী আবার কেমন নাম?'

'মীরাকে উল্টো করে ডাকতাম রামী। আমার সঙ্গে খুব উল্টো ধরনের আচরণ করতো তো, কাজেই আমি নামটা উল্টে দিলাম।'

'উনি রাগ করতেন না?'

'না। আমাদের চুক্তি ছিল — বিয়ের প্রথম দু'বছর কেউ কারো উপর রাগ করব না। দু'বছরের আগেই তো মামলা ডিসমিস। সে ফট করে মরে গেল। রাগারাগির আনন্দ আমরা কেউ পাইনি।'

'উনাকে জোছনা নামে কে ডাকত?'

'তোর বাবা ডাকত।'

নীতু বাবার দিকে তাকাল। সে বাবার মুখে কোন ভাবান্তর দেখল না। রেবেকার মুখও ভাবলেশহীন। তিনি বললেন, ইসমাইল, গানের ক্যাসেটটা দিয়ে দাও। গান শুনতে শুনতে যাই।

ইসমাইল যন্ত্রের মত ক্যাসেট চালু করল। পোলকা মিউজিক হচ্ছে। ঝড়ের মত বাজনা। খানিকক্ষণ শুনলেই নেশা ধরে যায়। নীতু লক্ষ্য করল, জহির চাচা গানের তালে তালে মাথা নাড়ছেন।

নীতু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল — তাজমহল। তাজমহল।

'বাবা দেখ বাংলাদেশী তাজমহল। জানালা দিয়ে তাকাও বাবা।'

মনজুর জানালা দিয়ে তাকালেন। কিছু দেখলেন না। নীতু বলল, ড্রাইভার চাচা, গাড়ি থামান। গাড়ি ব্যাক করতে হবে। বাবাকে তাজমহল দেখাব।

ইসমাইল গাড়ির গতি কমিয়ে আনল। মনজুর জহিরকে বললেন, বাংলাদেশী তাজমহল ব্যাপারটা কি?

'এখানে এক ভদ্রলোক একটা মসজিদ বানিয়েছেন অবিকল তাজমহলের ডিজাইন। তাজের গম্বুজের মত গম্বুজ।'

'ইন্টারেস্টিং তো।'

জহির হাই তুলতে তুলতে বললেন, এখানকার তাজমহলের স্থানীয় নাম বদমহল। যিনি বানিয়েছেন তাঁর নাম বদরুল। বদরুলের বদ এবং তাজমহলের মহল নিয়ে 'বদমহল।'

মনজুর হাসছেন। নীতু হাসছে। ইসমাইলের হাসি আসছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে না হাসতে। সাহেবের সামনে হেসে ফেলা ঠিক হবে না। এত বড় অভদ্রতা সে

করতে পারে না। শুধু রেবেকা চুপ করে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। বদমহল দেখার প্রতি তিনি কোন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

স্মৃতিসৌধে তারা ঢুকতে পারল না। মালয়েশিয়ার চীফ অব স্টাফ এসেছেন। তিনি ফুলের মালা দেবেন। কঠিন নিরাপত্তা। সকাল ন'টা পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দেবে না।

নীতু বলল, কি মুশকিল! আমরা নাশতা খাব কোথায়?

মনজুর বললেন, স্মৃতিসৌধে বসেই যে নাশতা খেতে হবে এমন তো কোন নিয়ম নেই। পথে কোথাও খেয়ে নিলেই হবে।

জহির বলল, পথে থামানোর দরকার নেই। আমরা বরং ঝড়ের গতিতে আরিচা চলে যাই। ফেরী পার হয়ে গেলে — বড় চিন্তা দূর হবে। আটটার আগে পৌঁছতে পারলে ভীড়ের চাপে পড়ব না।

রেবেকা বললেন, আটটার আগে কি পৌঁছা যাবে?

'ইসমাইলের উপর নির্ভর করছে। ইসমাইল যদি গাড়ির স্পীড একটু বড়িয়ে দেয় তাহলে পারা যাবে।'

'স্পীড বাড়ানোর দরকার নেই। এ্যাকসিডেন্ট হবে।'

'এ্যাকসিডেন্ট হবে না। আমি তের চুমুক কফি খেয়েছি।'

নীতু বলল, আমি একটু নামব। মালয়েশিয়ার চিফ অব ষ্টাফকে দেখব।

জহির বলল, দেখার কিছু নেই। বান্দরের মত চেহারা।

'কে বলল বাঁদরের মত চেহারা?'

'আমার অনুমান। পৃথিবীর সবদেশে সবচে খারাপ চেহারার মানুষ চিফ অব ষ্টাফ হয়।'

নীতু নামল গাড়ি থেকে। জহিরও নামলেন নীতুর সঙ্গে। অনেক চেষ্টা করেও মালয়েশিয়ার চিফ অব ষ্টাফকে দেখা গেল না। গাড়িতে উঠেই জহির বললেন, ইসমাইল মিয়া! একটু টেনে গাড়ি চালাতে পারবে?

ইসমাইল বলল, পারব স্যার।

'তাহলে একটু টেনে চলান।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

ইসমাইলকে টেনে গাড়ি চালাতে বলা হলেও সে গাড়ির স্পিডোমিটার পঞ্চাশ কিলোমিটারে ধরে রাখল। সে গাড়ি চালায় বড় সাহেবের হুকুমে। বড় সাহেব গাড়িতে ঝাঁকুনি পছন্দ করেন না। দ্রুত গাড়ি চালালে আচমকা থামতে হবে। ঝাঁকুনি

লাগবে। বড় সাহেব হুকুম দিলে ভিন্ন কথা। যে হুকুম দিচ্ছে বড় সাহেব তাকে পছন্দ করেন না। মুখে না বললেও এসব জিনিস বোঝা যায়।

মনজুর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যখন বেড়াতে আস তখন কি এমন চুপচাপ বসে থাক? কোন কথাবার্তা নেই — মূর্তির মত বসে আছ।

রেবেকা জবাব দিলেন না। নীতু বলল, মা এরকম চুপচাপ থাকে বাবা। কোন কথা নেই। শুধু আমি আর জহির চাচা বকবক করি।

'কই, জহিরও তো চুপচাপ।'

জহির ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে বললেন, আরিচা ঘাটে পৌঁছার পর ফেরীতে উঠব - তারপর বকবক শুরু করব। এখন আমি এক ধরনের টেনশানে আছি -- ফেরীতে দেরি হবে কি হবে না — এই টেনশান। দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

'কি সর্বনাশ?'

'সমস্ত প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে যাবে।'

'কি রকম?'

'জোছনা দেখায় গণ্ডগোল হয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছে ফেরী মিস্ করব।'

নীতু বলল, চাচা এটা কি আপনি সিক্সথ সেন্স থেকে বলছেন?

'না। বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে বলছি। আমি বসে বসে গুনছি মোট ক'টা গাড়ি আমাদের ওভারটেক করল। ঢাকা থেকে রওনা হবার পর মোট একচল্লিশটা গাড়ি আমাদের ওভারটেক করেছে।'

মনজুর বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই কি সত্যি সত্যি গাড়ি গুনছিস?

'হ্যাঁ গুনছি। অকর্মা লোকজন এইসব গোনার কাজ খুব ভাল পারে।'

মনজুর বললেন, **Quite interesting.**

নীতু বলল, জহির চাচার আরো অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, বাবা। উনার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল। অনেক কিছু আগেভাগে বলে দিতে পারেন।

'সত্যি না কি জহির?'

'না। সিক্সথ সেন্স-টেন্স কিছু না — চিন্তা-ভাবনা করেই যা বলার বলি। লোকে ভাবে সিক্সথ সেন্স। এখন আমি যদি বলি আরিচা ঘাটে দু'ঘণ্টা দেরি হবে এবং সত্যি সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে তোরা ভাববি আমার সিক্সথ সেন্স। আসলে তা না। আমি বসে বসে গাড়ি গুনেছি।'

মনজুর বললেন, আচ্ছা এখন বল, ক'টা গাড়ি ওভারটেক করেছে? শেষবার বললি একচল্লিশটি — তারপর থেকে আমিও গুনছি। বল দেখি মিলিয়ে দেখি।

'একচল্লিশের পরে আরো সাতটা গাড়ি ওভারটেক করেছে। একটা ট্রাক।

তিনটা বাস। আর তিনটা প্রাইভেট কার। হয়েছে?'

'হ্যাঁ। হয়েছে।'

'অবাক হয়েছিস?'

'হ্যাঁ, অবাক হয়েছি।'

নীতু খুশি-খুশি গলায় বলল, জহির চাচার অদ্ভুত সব ব্যাপার আছে। তিনি মানুষকে দারুণ অবাক করতে পারেন।

'তাই তো দেখছি।'

'যেতে যেতে আরো দেখবে। আচ্ছা বাবা, ছাত্র জীবনেও কি তিনি সবাইকে অবাক করতেন?'

'মনে পড়ছে না, মা।'

'তেতুলিয়ায় অদ্ভুত দৃশ্য কি দেখেছিলে সেটা কি মনে পড়েছে?'

'না।'

'মনে করার চেষ্টা করছ?'

'এতক্ষণ করছিলাম না। এখন করব। তবে মনে পড়বে বলে মনে হয় না।'

জহির বললেন, মনে পড়বে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, আজ দিনের মধ্যেই মনে পড়বে। শুধু তেতুলিয়ার অদ্ভুত দৃশ্য না। আরো অনেক কিছুই মনে পড়বে।

মনজুর কৌতূহলী চোখে জহিরের দিকে তাকালেন। জহির চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, তুই এখন আমার একটা অনুরোধ রাখ।

'কি অনুরোধ?'

'এখন তুই দয়া করে তোর ড্রাইভারকে একটু স্পীডে চালাতে বল। কেউ ওভারটেক করলে আমার ভয়ঙ্কর রাগ লাগে।'

নীতু বলল, আমারো লাগে। আমার মনে হয় আমাকে রেসে হারিয়ে দিল।

মনজুর বললেন, স্পীড দাও ইসমাল।

ইসমাইল গাড়ির গতি দেখতে দেখতে আশিতে নিয়ে এল। খোলা জানালা দিয়ে হুঁ-হুঁ করে হাওয়া আসছে। জহির বললেন, এখন গাড়িতে চড়ে মজা পাচ্ছি।

নীতু বলল, এ্যাকসিডেন্ট হবে না তো, চাচা?

জহির বললেন, না মা, এ্যাকসিডেন্ট হবে না।

মনজুর বললেন, এ্যাকসিডেন্ট যে হবে না, এটাও কি তুই বিচার-বিবেচনা থেকে বলছিস, না সিক্সথ সেন্স থেকে বলছিস?

'বিচার-বিবেচনা করে বলছি। তোর এটা নতুন মাইক্রোবাস। কাজেই সিস্টেম ফেইলিওরের সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। ইসমাইল মিয়া পাকা ড্রাইভার। আরিচার

রাস্তায় সে দীর্ঘদিন বাস চালিয়েছে। সে চালাবে খুব সাবধানে। এমনিতেই সে সাবধানী, আজ আরো বেশি সাবধানে চালাবে। কারণ গাড়িতে তুই আছিস।'

'বেশি সাবধানে অনেক সময় ভুল হয়।'

'দুর্বল নার্ভের ক্ষেত্রে ভুল হয়। আমি ভুল করব কিন্তু ইসমাইল মিয়া কিংবা তুই করবি না।'

'বলতে চাচ্ছিস আমার নার্ভ দুর্বল, না?'

'উঁহু, তোর নার্ভ ইস্পাতের মত।'

গাড়ি উড়ে চলেছে। জহির চুরুট ধরালেন। খুশি-খুশি গলায় ডাকলেন, ইসমাইল মিয়া।

'কি স্যার।'

'একশ' কিলোমিটার স্পীডে কখনো গাড়ি চালিয়েছেন?'

'চালিয়েছি স্যার।'

'আপনার মেক্সিমাম স্পীডের রেকর্ড কত?'

'একশ' কুড়ি।'

'এখানে সেই রেকর্ড ভাঙতে পারবেন?'

'পারব।'

'দেখি ভাঙুন তো। আপনার বড় সাহেব কিছু বলবেন না।'

ইসমাইল মিয়া গাড়ির স্পীড বাড়াল না। কমিয়ে দিল।

তাকে বাধ্য হয়েই কমাতে হল। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে — সামনে বড় ধরনের কোন সমস্যা হয়েছে। লাইন করে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে রোড ব্লকেড।

ইসমাইল একটা ট্রাকের পেছনে তার গাড়ি থামাল।

নীতু বলল, কি হয়েছে?

ইসমাইল নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এ্যাকসিডেন্ট। মানুষ মরছে।

'না দেখেই কি করে বললেন, মানুষ মারা গেছে।'

'মানুষ মরলে বোঝা যায় আফা।'

ইসমাইল গাড়ির জানালার কাচ নামিয়ে গলা বের করল। সামনের ট্রাকের পেছনে বসে থাকা হেল্পার দু'জনকে জিজ্ঞেস করল, কি হইছে?

হেল্পাররা জবাব দিল না। একজন পিচ করে থুথু ফেলল।

ইসমাইল মাথা ভেতরে টেনে নিয়ে বলল, অবস্থা খারাপ।

জহির হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, আমারো মনে

হচ্ছে অবস্থা খারাপ। আমাদের ফিরে যাওয়া ভাল। অপেক্ষা করলে আটকা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

মনজুর সাহেব বললেন, তোর সিক্সথ সেন্স বলছে, না অনুমান করছিস?

'দু'টাই।'

রেবেকা বললেন, খোঁজ নিলেই হয়।

জহির উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আমি খোঁজ নিতে যাচ্ছি।

নীতু বলল, চাচা আমি আসি?

'না, তুমি বসে থাক।'

জহির গাড়ি থেকে নামতে পারলেন না। সামনের ট্রাকটা সিগন্যাল দিচ্ছে — পেছাবে। মাইক্রোবাস ব্যাক করতে হল। ট্রাক অতি দ্রুত ঘুরে গেল। ঝড়ের মত রওনা হল ঢাকার দিকে। জহির বললেন, অবস্থা বেশ খারাপ বলেই মনে হচ্ছে। ট্রাকের পালিয়ে যাবার ঘটনা সচরাচর ঘটে না। জহির গাড়ি থেকে নামলেন।

এ দেশের মানুষ চুপচাপ থাকে না। তারা সমস্যার কথা বলতে ভালবাসে। আজ অবস্থা ভিন্ন। অনেকগুলি গাড়ি লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা কেউ নামেনি। জহির একজনকে পেল যে বিরক্তমুখে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে বললেন, কি ব্যাপার?

সে কঠিন মুখে বলল, জানি না।

জহির সামনের দিকে এগুচ্ছেন। ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেখানে যাওয়াই ভাল।

নীতু জানালা দিয়ে মাথা বের করে আছে। তার খুব ইচ্ছা করছে — জহির চাচার সঙ্গে যেতে। ব্যাপারটা কি তাহলে দেখে আসা যায়। সে মেয়ে হয়ে জন্মানোয় যেতে পারছে না। যদি ছেলে হয়ে জন্মাতো তাহলে নিশ্চয়ই যেতে পারত। এই পৃথিবীতে সবচে সুখী বোধহয় ছেলেরা।

নীতু বলল, বাবা তোমার কি নিচে নামতে ইচ্ছা করছে না?

মনজুর বললেন, না।

রেবেকা বিরক্ত গলায় বললেন, শুধু শুধু কথা বলছিস কেন নীতু। চুপ করে বসে থাক।

'আমরা বেড়াতে বের হয়েছি মা। চুপ করে বসে থাকার জন্যে বেড়াতে বের হইনি। বাড়িতে আমরা চুপ করে বসে থাকি।'

রেবেকা বললেন, আমার মাথা ধরেছে। বকবকানি শুনতে ভাল লাগছে না।

নীতু বলল, তুমি যদি মূর্তীর মত বসে থাক তাহলে মাথা আরো ধরবে। কলেজে মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড মাথা ধরে। তখন আমি হাসির গল্প করি। সবাইকে

হাসাই নিজেও হাসি। তখন মাথা ধরাটা একটু কমে।

মনজুর বললেন, তোর কি প্রায়ই মাথা ধরে?

'প্রায়ই না। মাঝে মাঝে। ধর মাসে একবার কি দু'বার।'

'ডাক্তারের সঙ্গে কোন কথা বলেছিস?'

'ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব কেন? আমার অসুখতো আমি নিজেই সারাতে পারি। মা আমি কি তোমার মাথা ধরা সারিয়ে দেব?'

রেবেকা কিছুই বললেন না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। নীতু বলল এই গল্পটা শোন মা — ব্লাড ব্যাঙ্ক যেমন রক্ত পাওয়া যায় তেমনি ব্রেইন ব্যাঙ্ক পাওয়া যায় ব্রেইন। যাদের ব্রেইন নেই তারা ব্রেইন ব্যাঙ্ক থেকে ব্রেইন কিনতে পারে। একদিন এক লোক ব্রেইন কিনতে গিয়েছে। দাম জিজ্ঞেস করেছে। ব্রেইন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বলল, আমাদের অনেক ধরনের ব্রেইন আছে — আপনি কোনটা নেবেন? সবচে সস্তা হল লেখকদের ব্রেইন কারণ তাঁরা এটা খুব বেশি ব্যবহার করেন, এরচে একটু দাম ব্যবসায়ীদের ব্রেইন তাঁরাও বেশ ব্যবহার করেন। সবচে দামী হল মিলিটারীদের ব্রেইন কারণ তারা কখনো ব্যবহার করেন না। ওদের ব্রেইন বলতে গেলে নতুনই থাকে।

গল্প শুনে মনজুর হাসছেন। শব্দ করে হাসছেন। রেবেকার কোন ভাবান্তর নেই। তিনি আগের মতই চুপ করে বসে আছেন। মনজুর বললেন, তোর গল্পটা ইন্টারেস্টিং তবে ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোর মা'র মাথা ব্যথা গল্প শুনে আরো বেড়ে গেছে।

ঘটনা ভয়াবহ।

কুড়ি মিনিট আগে একটা প্রাইভেট গাড়ি — পাজেরো জীপ এ্যাকসিডেন্ট করেছে। ন'দশ বছরের এক বোন তার ছোট ভাইকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। তাদের চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। ভাইটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। বোন আহত হয়ে পড়েছিল, তাদের পাশ দিয়ে অনেক গাড়ি গিয়েছে, কেউ আহত মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করেনি। যে অল্প ক'জন গ্রামবাসী ছিল তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কোন একটা গাড়ি থামাতে। কেউ থামেনি। তাদের এত সময় নেই।

ক্রমে ক্রমে লোক জড় হয়েছে। তারা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাস্তার উপর বসে জটলা পাকাচ্ছে।

জহির ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হলেন, এবং শিউরে উঠলেন। ছেলেটির থেঁতলানো শরীর রাস্তায় পড়ে আছে। কালো পিচের উপর লাল রক্ত — খানিকটা কালচে হয়ে এসেছে। এই দৃশ্য একবারের বেশি দ্বিতীয়বার দেখা যায় না। ভাই এবং বোনটির শবদেহ রাস্তায় আড়াআড়ি করে রাখা হয়েছে। রোড ব্লকের জন্যে গ্রামবাসী বোধহয় এই ছোট্ট শরীর দু'টি ব্যবহার করছে।

খুব বেশি মানুষ এখনো জড় হয়নি। কুড়ি-পঁচিশজনের একটা দল। তারা রাস্তার পাশে গোল হয়ে বসে আছে। এদের মধ্যে কোন মহিলা নেই। বাচ্চা-কাচ্চাও নেই। একসিডেন্টের খবর এখনো ছড়িয়ে পড়েনি। নিহতদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। থাকলে চিৎকার করে কাঁদত। কেউ কাঁদছে না। মানুষ দলবদ্ধ হলেই আপনা-আপনি দলের একজন নেতা হয়ে যায়। কুড়ি-পঁচিশজনের দলটির যে নেতা তার বয়স চল্লিশের মত। পরনে লুঙ্গি এবং সবুজ কালো শার্ট। চোখ-মুখ কঠিন।

জহির তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। বিনয়ী গলায় বললেন কি হয়েছে আমাকে একটু বলবেন?

'কি হইছে আপনে শুনছেন। আবারও শুনতে চান ক্যান?'

'আপনারা কি চাচ্ছেন তাই জানতে চাচ্ছি।'

'আমরা কিছু চাই না।'

'রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন কেন?'

'রাস্তা বন্ধ আপনেরে কে বলছে? চইল্যা যান। মরা দুই বাচ্চার উপর দিয়া গাড়ি চালাইয়া যান গিয়া। আমরা কিছু বলব না।'

'আপনারা কি পুলিশে খবর দিয়েছেন?'

'কেউরে খবর দেই নাই।'

'ডেড বডি দু'টা এভাবে ফেলে না রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলে কেমন হয়?'

'ক্যান, দেখতে ভাল লাগে না?'

লোকটি কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জহির থমকে গেলেন। লোকটির চোখের দিকে তাকিয়েই বোঝা যাচ্ছে — অবস্থা অনেক জটিল হবে। অতি দ্রুত সরে পড়তে হবে।

গ্রামবাসী আসতে শুরু করেছে। তারা দলে দলে আসবে। আশপাশের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এদের সঙ্গে যুক্ত হবে। এদের সঙ্গে মিশবে কিছু সুযোগ-সন্ধানী দুষ্ট মানুষ, যাদের লক্ষ্য থাকবে লুটপাটের দিকে, ভাঙচুরের দিকে। পুলিশ আসবে। অল্প সংখ্যক আসবে। অবস্থা দেখে ভড়কে যাবে। ফেরত চলে যাবে। পুলিশ সব সময় যা করে তা হচ্ছে — প্রথম ঝড় বয়ে যেতে দেয়। ঝড়ের পর পর এক ধরনের শান্ত ভাব আসে। পুলিশ আসে তখন। ঝড়ের প্রথম ধাক্কা তারা গায়ে নিতে চায় না। তার প্রয়োজন নেই।

জহির মাইক্রোবাসের দিকে ফিরছেন। একটা পাজেরো জীপ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যুবকের মাথা বের হয়ে এল। চোখে সানগ্লাস। সে বিরক্ত চোখে বলল, ব্রাদার, কি দেখে এলেন? নিগোসিয়েশন হচ্ছে?

তিনি বললেন, হচ্ছে।

'গুড। কি যে দেশের অবস্থা, সামান্য ব্যাপারেই রোড ব্লক।'

জহিরের ইচ্ছা হল, বলেন, 'ব্যাপার সামান্য না। দু'টা ছোট ছোট বাচ্চা মারা গেছে। তিনি কিছু বললেন না। কথা বলে নষ্ট করার সময় নেই। ঢাকা ফিরে যেতে হবে। প্রবল নিম্নচাপ ঝড়ে রূপান্তরিত হবার আগেই ফিরে যেতে হবে। সময় নেই।

জহির গাড়ি গুনতে গুনতে এগুচ্ছেন। তাঁদের আগে ষোলটি গাড়ি। পেছনে দশটি। গাড়ির সঙ্গে গাড়ি লেগে আছে। গাড়ি ঘুরানো সম্ভব নয়। প্রায় ন'টা বাজতে চলল। কড়া রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। আজ সুন্দর জোছনা হবে। জহির গাড়িতে উঠে এলেন। রেবেকা বললেন, সার্ভে রিপোর্ট কি?

'রিপোর্ট ভাল না। বেশ কিছুক্ষণ আটকা থাকতে হবে।'

'বেশ কিছুক্ষণ মানে কতক্ষণ?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাদের তাহলে করণীয় কি?'

'আমাদের করণীয় হচ্ছে ঢাকায় ফিরে যাওয়া। আমি সেই চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলা যাক।'

নীতু হাসিমুখে বলল, আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে চাচা।

'কি দুঃসংবাদ মা?'

'ব্রেকফাস্টের জন্যে দু'টা প্যাকেট আলাদা করা হয়েছিল। দু'টার মধ্যে একটা এসেছে। অন্যটা আসেনি।'

'একটাতেই কাজ সারতে হবে।'

'সেই একটাতে আছে শুধু থালা-বাসন, চামচ, গ্লাস, ন্যাপকিন। আপনার খুব খিদে লাগলে — কাঁটাচামচ দিয়ে ন্যাপকিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে হবে।'

নীতু খিলখিল করে হাসছে। মনে হচ্ছে এমন আনন্দময় ঘটনা তার জীবনে আর ঘটেনি। জহির বললেন, খাওয়ার পানি আছে তো?

'আছে।'

'কতটা আছে?'

'প্রচুর আছে। ইচ্ছা করলে আপনি গোসলও করতে পারেন।'

নীতু আবার হাসছে। জহির বললেন, এখানে অনিশ্চিত অবস্থায় বসে থাকার চেয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়াই কি ভাল না? মনজুর, তুই কি বলিস?

'আমি কিছুই বলছি না। বেড়াতে যাবার প্ল্যান তোর। যা করার তুই করবি। তবে তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই ঘাবড়ে গেছিস।'

'ঘাবড়ে যাবার মতই ব্যাপার ঘটেছে। দু'টা বাচ্চা মারা গেছে এ্যাকসিডেন্টে। মনে হচ্ছে ঝামেলা হবে। সারাদিনই হয়ত রাস্তা বন্ধ থাকবে।'

'সারাদিন রাস্তা বন্ধ থাকবে না। কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। ঢাকা-আরিচা সড়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। সারাদিন এটা বন্ধ থাকবে না।'

'আমার সিক্সথ সেন্স অন্য কথা বলছে।'

'বলুক।'

জহির গাড়ি থেকে নামলেন। নীতু বলল, মা, আমি চাচার সঙ্গে যাই? বসে থাকতে ভাল লাগছে না। রেবেকা বললেন, যা। নীতু গাড়ি থেকে নেমে গেল। দু'টি বাচ্চা মারা গেছে এই খবরে সে মোটেই বিচলিত বোধ করছে না। হয়ত ভাল করে শুনেই নি।

নীতু গাড়ি থেকে নেমেই বলল, চাচা, আমার কাছে চুইংগাম আছে। খাবেন?

'না।'

'খুব সুন্দর জায়গায় আমাদের গাড়ি থেমেছে। দেখুন রাস্তার দু'ধারে কি সুন্দর সুন্দর গাছ। এই গাছগুলির নাম জানেন?'

'জানি। জারুল গাছ।'

'জারুল গাছে ফুল হয়?'

'হয়, বেগুনি রঙের ফুল।'

'চাচা, আপনাকে এমন চিন্তিত লাগছে কেন?'

'বুঝতে পারছি না, কেন?'

'চলুন আমরা এ্যাকসিডেন্টের জায়গাটা দেখে আসি।'

'না।'

'না কেন?'

'ডেড বডি দু'টা পড়ে আছে। দেখলে তোর ভাল লাগবে না।'

জহির চুরুট ধরালেন। এখন কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাচ্চ দু'টির বাবা-মা হয়ত চলে এসেছে।

'চাচা!'

'কি মা?'

'কে কাঁদছে চাচা?'

'জানি না তো মা। বাচ্চা দু'টোর আত্মীয়স্বজন হবে।'

'একটা মেয়ে কাঁদছে।'

'হয়ত ওদের মা।'

'ওরা কি ভাইবোন?'

'হুঁ।'

'ওদের নাম কি?'

'নাম জানি না, মা। কাউকে জিজ্ঞেস করি নি।'

'আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, আপনি ওদের নাম জেনে আসুন।'

'নাম দিয়ে কি হবে?'

'আমার নাম জানতে ইচ্ছা করছে।'

নীতু দাঁড়িয়ে রইল। জহির এগুচ্ছেন। তাঁর চুরুট নিভে গেছে। ঘোর পাওয়া মানুষের মতই তিনি নেভা চুরুটে টান দিচ্ছেন। পাজেরো জীপের কাছে এসে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। জীপের ভেতর ক্যাসেট বাজছে। রবীন্দ্র সংগীত হচ্ছে।

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে,
তাহারি রাগিনী লাগিল গায়ে।
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার
সুদূর বিরহ বিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা, সাগরবেলার
অধীর বায়ে, বনের ছায়ে।

সুন্দর লাগছে গান শুনতে। পাজেরোর পেছনের সীটে বাইশ-তেইশ বছরের দু'জন তরুণী। চালকের সীটে যে যুবক বসে আছে তার পাশেও অল্পবয়েসী একটি মেয়ে। সম্ভবত যুবকটির স্ত্রী। এরা সবাই পেপারকাপে চা খাচ্ছে। জহিরকে দেখে যুবক মাথা বের করে বলল, কিছু হল ব্রাদার?

জহির বলল, না।

যুবকটি নিচু গলায় মেয়েগুলিকে কিছু বলল। সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। নিশ্চয়ই অপমানসূচক কিছু কথা। এই বয়সের যুবক-যুবতীরা বয়স্কদের নিয়ে রসিকতা করতে পছন্দ করে।

জহির বলল, আপনি কি আমাকে নিয়ে কিছু বললেন?

যুবক তৎক্ষণাৎ বলল, জ্বি না স্যার। আপনি যান — নিগোসিয়েশান করুন। আপনি ছাড়া নিগোসিয়েশন হবে না।

জহির এগিয়ে যাচ্ছে। যুবকটি মনে হয় আবারো কোন রসিকতা করছে। সবাই হাসছে। তাদের দেড়শ' গজ সামনে দু'টি মৃতদেহ। এতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে না। সম্ভবত এরা মৃতদেহ দুটি দেখেনি। শুধু শুনেছে। শুনে বিরক্ত বোধ করছে — দু'টি প্রাণহীন দেহ তাদের আটকে ফেলেছে। তারা নড়তে পারছে না। এই অবস্থা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

জহির আবার ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে হাজির হল। **Eye of the cyclone.** প্রচুর লোক এর মধ্যে জড় হয়ে গেছে। বাচ্চা দু'টির বাবা-মা আছেন। বাবা মৃত মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন। মাছি আসছে। তিনি মাছি তাড়াতে ব্যস্ত। মেয়ের গায়ে তিনি মাছি বসতে দেবেন না। ছেলের দেহের ধ্বংসাবশেষের দিকে তিনি ফিরেও তাকাচ্ছেন না। সম্ভবত এই দলামচা মাংসপিণ্ডকে তিনি নিজের সন্তান বলে স্বীকার করেন না। বাচ্চা দু'টির মা'র বয়স অল্প। গ্রামের মেয়েরা অল্প দিনেই বুড়িয়ে যায়। এই মেয়ে তার শরীরে তারুণ্য ধরে রেখেছে। মেয়েটির বর্তমানে কোন বোধশক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে কিছুক্ষণ পর পর বলছে, গফুর, গফুর। ছেলেটির নাম গফুর। মেয়েটির কি নাম? জোছনা না তো?

জহিরের শরীর ঝিনঝিন করে উঠল। তাঁর মন বলছে — এই মেয়েটির নাম জোছনা।

জহির মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন — যে মেয়েটি মারা গেছে তার নাম কি?

মহিলা কিছুক্ষণ সন্দেহজনক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, জোছনা। এই মাইয়ার নাম জোছনা।

'ইনিই কি জোছনার মা?'

'না। জোছনার মা মারা গেছে। এ সৎমা।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনে কেডা?'

'আমি কেউ না। আমি দিনাজপুরের একজন যাত্রী।'

জড়-হওয়া লোকজনদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। একজন কে যেন বলল, ওসি সাহেব আসতেছেন। ওসি সাহেব।

জহির দেখলেন, মোটর সাইকেলে চড়ে দু'জন আসছেন। দু'জনই সাদা পোশাকে। পুলিশের লোক বলে মনে হচ্ছে না। তবে পেছনের জনের হাতে ওয়াকিটকি। পরিশ্রম এবং উত্তেজনায় ওসি সাহেব ক্লান্ত।

তিনি মোটর সাইকেল থেকে নামতে নামতে বললেন, কী ব্যাপার? এখানে ইয়াছিন মোল্লা কে? ইয়াছিন মোল্লা আছে?

রোগা একজন মানুষ এগিয়ে এল।

'স্লামালিকুম ওসি সাহেব!'

'ওয়ালাইকুম সালাম। খবর ভাল ইয়াছিন?'

'আমি ইয়াছিন মোল্লা না স্যার। আমি তার বড় ভাই।'

'নাম কি আপনার?'

'ছগির মোল্লা।'

'আপনি করেন কি?'

'জমি জিরাত আছে। বাজারে একখান ঘর আছে।'

দেখি, আসেন দেখি আমার সঙ্গে।'

ছগির মোল্লা এগিয়ে যাচ্ছে। ওসি সাহেব তাকে আড়ালে নিয়ে যাচ্ছেন। ইয়াছিন মোল্লা এ অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী মানুষ। ওসি সাহেব তাঁর সঙ্গে কোন একটা আপোসে আসতে চাচ্ছেন। 'আপাতত ছগির কে পাওয়া গেল। তাকে পাঠিয়ে ইয়াছিনকে আনা হবে।'

জহিরের মনে হচ্ছে — ওসি সাহেব মানুষটা বুদ্ধিমান। পুলিশের লাইনের ঘাঘু লোক। সে সমস্যা মিটিয়ে ফেলবে।

ওসি সাহেব ছগিরকে নিয়ে এগুচ্ছেন। তাঁর পেছনে জনতার একটা ক্ষুদ্র অংশ। ওসি সাহেবকে হ্যামিলনের বংশি বাদকের মত দেখাচ্ছে। তবে বাঁশির বদলে তাঁর হাতে 'ওয়াকি টকি'। ওসি সাহেব আচমকা থমকে দাঁড়ালেন। দলটাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই যে আপনারা কি চান?'

'কেউ শব্দ করল না।'

'আমি ছগির মোল্লাকে গোপনে দু'একটা কথা বলব। কি বললাম সেটা ছগিরের কাছে শুনে নেবেন। এই দেশে গোপন কথা সবাই জানে — প্রকাশ্য কথা কেউ জানে না। আপনারা এখানে দাঁড়ান। আর এক পা আসবে না।'

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। ওসি সাহেব ছগির কে নিয়ে এগুচ্ছেন? ছগিরের ভয় ভয় লাগছে।

'ছগির মোল্লা?'

'জ্বি স্যার।'

'ইয়াছিন মোল্লা কোথায়?'

'বাসায় ঘুমায়ে আছে। জ্বর হইছে।'

'জ্বর হোক আর কলেরা হোক, তাকে এক্ষণ নিয়ে আসতে হবে। পারবেন না?'

'পারব স্যার।'

'এখানে দলের মাথাটা কে? গাড়ি আটকায়েছে কে?'

'সবাই মিল্যা আটকাইছে।'

'সবাই মিলেই আটকায় কিন্তু মাথা থাকে একটা। সেই মাথাটা কে?'

'জানি না স্যার।'

'না জানলে কি আর করা। আপনাকে যা করতে বলেছি করেন। ডবল মার্চ। দৌড়ে যান।'

রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলেই বোধহয় মনজুর সাহেবের ঘুম ঘুম পাচ্ছে। তিনি পা মেলে দিয়েছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। তিনি সিগারেট ছেড়েছেন অনেকদিন হল। তবু মাঝে মাঝে নেশা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিছুতেই তাকে পোষ মানানো যায় না। তিনি ইসমাইলকে সিগারেটের খোঁজে পাঠিয়েছেন। আশেপাশে দোকানপাট নিশ্চয়ই আছে। রেবেকা বললেন, এভাবে শুয়ে আছ কেন? শুতে ইচ্ছে করলে মাথার নিচে বালিশ দিয়ে ভালমত শোও।

'দাও, বালিশ দাও।'

রেবেকা বালিশ দিতে দিতে বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

'হুঁ।'

'আমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসে তুমি দেখি ভাল ঝামেলায় পড়েছ।'

'ঝামেলা আর কি! ঝামেলা কেটে যাবে।'

'কেটে যাবে বলছ কেন?'

'সব ঝামেলাই কাটে। এই জন্যে বলছি ঝামেলা কেটে যাবে।'

'কতক্ষণে কাটবে সেটাই হচ্ছে কথা।'

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বললেন, বেশিক্ষণ লাগবে না। পুলিশ এসে গেছে। ওরা সামাল দেবে।

'কই, আমি তো পুলিশ দেখিনি।'

'সাদা পোশাকে এসেছে বলে বুঝতে পারনি। সাদা পোশাক মানে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যা মেটাতে এসেছে। কাজেই আমার ধারণা, আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রীন সিগন্যাল পাবে।'

'তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

'হুঁ।'

'এক প্যাকেট চকলেট আছে। চকলেট খাবে?'

'না। চকলেট খাবার বয়স নেই।'

'বেড়াতে বের হবার সময় বয়স ঘরে ফেলে রেখে বের হতে হয়।'

'কার কথা, জহিরের?'

'হ্যাঁ।'

'জহির মনে হয় মজার মজার কথা বলে।'

'সেটা নিশ্চয়ই কোন দোষ না।'

'দোষের কথা বলছি না। আমি এপ্রিসিয়েট করছি।'

'তোমার কোনটা এপ্রিসিয়েশন আর কোনটা না, তা বোঝা কষ্ট।'

রেবেকা তাঁর হ্যান্ডব্যাগ খুলে রাংতামোড়া চকলেটের একটা সুদৃশ্য প্যাকেট বের করলেন। চকলেট ভাঙতে ভাঙতে বললেন, খাও, তোমার ভাল লাগবে।

মনজুর হাত বাড়িয়ে চকলেট নিলেন, মুখে দিলেন না। রেবেকা বললেন, এই কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার সঙ্গে যত কথা বললাম, গত এক বছরে বোধহয় এত কথা বলিনি।

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ। গত পরশু সারাদিনে এবং রাতে তোমার সঙ্গে ক'টি কথা হয়েছে বল তো?'

'বলতে পারছি না।'

'দু'টি মাত্র বাক্য। তুমি রাত এগারোটায় ঘরে ফিরে বাথরুমে ঢুকে গেলে। বাথরুম থেকে বের হবার পর আমি বললাম, 'টেবিলে খাবার দিতে বলব?' তুমি বললে, 'না। খেয়ে এসেছি।' বলেই ঘুমুতে চলে গেলে। কাজেই চব্বিশ ঘণ্টায় আমি তোমাকে চার শব্দের একটি বাক্য বলেছি — তুমি তিন শব্দে জবাব দিয়েছ।'

'পরশু সারাদিন বাইরে ছিলাম। কাজেই পরশু দিনের স্টেটিসটিকস্ বাদ দিতে পার।'

'যে কোন দিনের স্টেটিসটিকস্ই তুমি নাও না কেন — আমাদের কথাবার্তা কয়েকটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।'

মনজুর এক টুকরা চকলেট মুখে দিতে দিতে বললেন, আমি কথা কম বলি এটা একটা কারণ হতে পারে।

'তুমি কথা কম বল তা ঠিক তবে সবার সঙ্গে না। আমার সঙ্গে। আমি যতদূর জানি, জহিরের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তুমি রোজ হেঁটে হেঁটে মালিবাগ থেকে

পুরানা পল্টন চলে আসতে। ফিরতে ফিরতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যেত। কোন কোন রাতে ঝড়-বৃষ্টি হলে থেকে যেতে।'

'কে বলেছে জহির?'

'কে বলেছে তা জরুরী নয়। ঘটনা সত্যি কিনা তা যাচাই করাটা জরুরী।'

'সেটাও জরুরী নয়।'

'তোমার জন্যে নয়। আমার জন্যে জরুরী।'

'কারোর জন্যেই জরুরী নয়। পুরানো দিনের ফাইল সঙ্গে নিয়ে ঘোরা কাজের কথা না। বিশেষ করে বেড়াতে যাবার সময় ফাইল পত্র রেখে আসতে হয়।'

ইসমাইল ফিরে এসেছে। সে সিগারেট পায়নি, তবে কারো কাছ থেকে হয়ত একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে এসেছে। মনজুর সাহেব সিগারেট ধরালেন। ইসমাইল বলল, রাস্তা অল্প সময়ের মধ্যেই 'কিলিয়ার' হইব স্যার।

মনজুর সাহেব বললেন, আচ্ছা, তুমি আশেপাশেই থাক। তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, রেবেকা, একটা ডেড ইস্যু নিয়ে কথা বলার জন্যে এটা শ্রেষ্ঠ সময় নয়। আরো সময় পাওয়া যাবে।

রেবেকা বললেন, তুমি ভুল বলছ। সময় পাওয়া যাবে না। তোমার সময়ের খুব টানাটানি। আজ যখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে তখন কথা বলা যাক।

'সুযোগ আরো পাবে।'

'রেবেকা কঠিণ গলায় বললেন, না। আমি আর সুযোগ পাব না। আমি মনস্থির করেছি তোমার সঙ্গে বাস করব না।'

'বুঝতে পারছি না, কি বলছ?'

'আরেকবার বলব?'

'না। আরেকবার বলতে হবে না। কবে ঠিক করেছ তুমি আর আমার সঙ্গে বাস করবে না?'

'বছর পাঁচেক আগে ঠিক করেছি।'

'এতদিন অপেক্ষা করলে কেন?'

'মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছি। ওকে বুঝানোর ব্যাপার আছে।'

'ওকে বুঝিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সিদ্ধান্ত ও মেনে নিয়েছে?'

'মেনে নিয়েছে বলেই তো মনে হয়। নীতু বোকা মেয়ে নয়।'

'বোকা মেয়ে নয় বলেইতো সমস্যা। বোকা মেয়েরা ঝামেলা করে না। বাবা মা'র কথা মেনে নেয়। ঝামেলা করে বুদ্ধিমতীরা।'

'নীতু ঝামেলা করবে না।'

'এটা তাহলে আমাদের শেষ একত্র ভ্রমণ?'

'হ্যাঁ শেষ। শুরু এবং শেষ। আমরা কিন্তু এই প্রথম বাইরে যাচ্ছি।'

'এই প্রথম যাচ্ছি তা কিন্তু না। এর আগেও গিয়েছি। গত বছর সিঙ্গাপুর গেলাম। তুমি সঙ্গে ছিলে, নীতু ছিল।'

'তুমি বেড়াতে যাওনি। কাজে গিয়েছ। আমরা তোমরা কাজের সঙ্গি হয়েছি। তুমি কাজ নিয়ে থেকেছ। আমি মেয়েকে নিয়ে একা একা মলে ঘুরেছি। আমাদের এক সঙ্গে একটা রোজ গার্ডেনে যাবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত তাও হয়নি।'

'তুমি কি ঠিক করেছ? আবার নতুন জীবন শুরু করবে?'

'নতুন করে জীবন শুরু করা বলতে তুমি যদি বিয়ে করা বোঝাও তাহলে তার জবাব হচ্ছে — 'না।' আমার সেই বয়স নেই, ইচ্ছাও নেই। আমি আলাদা থাকব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। নিজের ছোট্ট সংসার নিজের মত করে সাজাব।'

'এখনকার সংসার নিজের সংসার না?'

'না।'

মনজুর বললেন, তুমি আমাকে পছন্দ কর না?

রেবেকা বললেন, পছন্দ করি কিন্তু ভালবাসি না। পছন্দ এবং ভালবাসা এক জিনিস না। এইটুকু নিশ্চয়ই বোঝ?

'তা বুঝি।'

মনজুর উঠে বসলেন। তিনি গাড়ি থেকে নামবেন। রেবেকার দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বললেন, নেমে খানিকক্ষণ হাঁটবে? গাড়ির ভেতর গরম হয়ে আছে।

'না।'

'হাঁটতে তো দোষ নেই। পছন্দের মানুষের সঙ্গে হাঁটা যায়।'

'অপছন্দের মানুষের সঙ্গেও হাঁটা যায়। কিন্তু এখন আমার গাড়ি থেকে নামতে ইচ্ছা করছে না। তুমিও বস। কয়েকটা কথা বলি।'

মনজুর বসলেন। স্ত্রীর পাশেই বসলেন। রেবেকা বললেন, তুমি আমার সামনে বসো। এসো For a change আমরা মুখোমুখি বসি। মনজুর তাই করলেন। শুধু তাই না। সহজ ভাবে হাসলেন।

মনজুর বললেন, কি কথা বলবে? ঝগড়ার কথা?

'না, ঝগড়ার কথা না। তুমি আমি আমরা দু'জনই ঝগড়ার বয়স পার হয়ে এসেছি।'

'এখন আমাদের কিসের বয়স?'

রেবেকা শান্ত গলায় বললেন, **Age of realization** তুমি কি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

'হ্যাঁ, দেব।'

'তুমি জহিরের স্ত্রীর একটা আলাদা নাম দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'জোছনা?'

'হ্যাঁ, জোছনা।'

'আলাদা নাম দিলে কেন? তার তো একটা নাম ছিলই।'

'জানতে চাচ্ছ কেন?'

'এম্নি জানতে চাচ্ছি।'

'একদিন জহিরের বাসায় আমার রাতে খাবার দাওয়াত। খেতে বসেছি। মীরা বলল, মনজুর ভাই, আপনি আমাকে সুন্দর একটা নাম বেছে দিন তো — মীরা নামটা আমি বদলাব। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে এক মহিলা আছেন, তাঁর নামও মীরা। এমন ঝগড়াটে মহিলা আমি জীবনে দেখিনি। আপনি সুন্দর একটা নাম বেছে বার করুন।'

'তুমি জোছনা নাম বের করলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কোন কারণ নেই। সেই মুহূর্তে এই নাম মনে এসেছিল বলেই বলেছি। অন্য নামও মনে আসতে পারত। আমি রুবিনা বলতে পারতাম, রত্না বলতে পারতাম। তা না বলে জোছনা বলেছি। তার পরেও এই নাম বলার পেছনে একটা কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'জোছনা হল আমাদের জহিরের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। সে সব সময় জোছনা জোছনা করে। জোছনা রাতে সারারাত ছাদে বসে থাকে। আমি জহিরের কথা ভেবেই তার নাম জোছনা রেখেছি। এই যুক্তি কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে?'

রেবেকা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, গ্রহণযোগ্য।

'আমি কি এখন নেমে যেতে পারি?'

রেবেকা কিছু বললেন না। মনজুর গাড়ি থেকে নেমে গেলেন।

যাত্রীদের প্রায় সবাই গাড়ি থেকে নেমে গেছে। জায়গায় জায়গায় জটলা হচ্ছে। টকটকে লাল রঙের টাই পরা এক ভদ্রলোক চাপা গলায় বলছেন, কেউ কখনো শুনেছেন কোন সভ্য দেশে রোড একসিডেন্টের জন্যে রোড ব্লক হয়? রাস্তা কি দোষ করল? আমরা কি দোষ করলাম?

লাল টাই-পরা মানুষটির পাশে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, আমাদের দোষ হচ্ছে আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি।

'দ্যাটস রাইট। এটা বিচিত্র একটা দেশ। এই দেশ রাস্তা পছন্দ করে না। আমাদের প্রথম কাজ হল রাস্তা বন্ধ করে দেয়া। এই দেশের নেতারা মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দেবেন না। বক্তৃতা দেবেন রাস্তায়, যাতে মানুষের অসুবিধা হয়। এই দেশে যিনি যতবেশি মানুষের অসুবিধা করবেন — তিনি তত বড় নেতা। এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে — কি করা যাবে? এ্যাকসিডেন্ট তা হয়ই। ছোট্ট রাস্তা। গিজ গিজ করছে মানুষ। এখনো হাইওয়েতে লোকজন ধান শুকায়। ছেলেমেয়েরা খেলা করে। এখানে এ্যাকসিডেন্ট হবে না তো কোথায় হবে? এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে — এম্বুলেন্স আসবে — পুলিশ আসবে। কিন্তু আসেনি। শুনতে পাচ্ছি, একজন ওসি সাহেব এসেছেন। আসার পর থেকে তিনি শুধু কানাকানি করে বেড়াচ্ছেন। এর সঙ্গে কানে কথা বলেন, ওর সঙ্গে কানে কথা বলেন। আপনারা কি কখনো শুনেছেন কোন সভ্য দেশের পুলিশ শুধু কানাকানি করে বেড়ায়?'

একজন বলল, ভাই, আপনি বারবার সভ্য দেশ সভ্য দেশ করছেন কেন? আপনাকে কে বলেছে এটা সভ্য দেশ?

অনেকেই হেসে উঠল। মনজুর সাহেব লক্ষ্য করলেন, দলটির মধ্যে তাঁর ড্রাইভার ইউনুসও আছে। ইউনুস হাসছে না। সে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে এদের কথাবার্তা তার পছন্দ হচ্ছে না।

মাথার উপর কড়া রোদ। এমন কড়া রোদে মনজুর অনেকদিন হাঁটেননি। হাঁটতে ভাল লাগছে। তিনি উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা হাঁটছেন না। মেয়েকে খুঁজছেন। এক জায়গায় কয়েকজন মহিলার জটলা দেখতে পেলেন। ডাব বিক্রি হচ্ছে। ষোল-সতেরো বছরের একটা ছেলে দুই কাঁদি ডাব নিয়ে এসেছে। এক একটা চারটাকা করে বিক্রি হচ্ছে। ডাবের দাম নিয়ে মহিলাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।

'একটা ডাব চারটাকা। কোন মানে হয়? ঢাকাতেই তো তিন টাকা করে ডাব পাওয়া যায়।'

মনজুর সাহেবের ইচ্ছা করছে, বলেন — ঢাকায় তিনটাকা করে ডাব পাওয়া গেলে ঢাকায় গিয়ে খেয়ে আসুন।

যে ছেলেটি ডাব বিক্রি করছে সে সম্ভবত নির্বোধ প্রকৃতির। কথা শুনে যাচ্ছে। কোন জবাব দিচ্ছে না। তবে ডাব কাটায় সে উস্তাদ। কচ করে এক কোপে কেটে ফেলছে। তার কাটার ভঙ্গি দেখলে মনে হয় ডাব কাটাটা খুব আরামদায়ক ব্যাপার।

এক স্থূলকায়া মহিলা বললেন, এই ছেলে ডাবটা মাঝখান দিয়ে দু' ফাঁক করে দাও। শাঁস খাব।

ছেলে ডাব দু'ফাঁক করে দিল।

মহিলা বিরস্ গলায় বললেন, শাঁস খাব কি ভাবে? এই ছেলে, চামচ জোগাড় করে দিতে পারবে?

মনজুর এখন যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছেন। কি অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা —। একজনকে দেখা গেল — ডাবের পানি চোখে-মুখে ছিটাচ্ছে। পানির অভাবেই কি ডাবের পানিতে মুখ ধোয়া হচ্ছে? না ডাবের পানি ব্যবহারের অন্য কোন কারণ আছে?

'বাবা!'

মনজুর চমকে উঠলেন। নীতু পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নীতু বলল, আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ। কি দেখছ?

'ডাব বিক্রি করা দেখছি।'

'ডাব বিক্রি করায় দেখার কি আছে?'

'যখন কিছুই দেখার নেই — তখন সামান্য জিনিসও দেখতে ভাল লাগে। তুই ডাব খাবি?'

'উঁহু।'

'ডাবের শাঁস খাবি?'

'হ্যাঁ, খাব।'

মনজুর সাহেব ডাব কিনতে এগিয়ে গেলেন। ডাব পাওয়া গেল না। সব বিক্রি হয়ে গেছে। ডাবওয়ালা একটা পাঁচশ' টাকার নোট হাতে হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এক মহিলা তিনটি ডাবের দাম পাঁচশ' টাকা দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে ভাঙতি নেই।

ভদ্রমহিলা রাগী গলায় বললেন, হা করে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভাঙতি দাও।

'ভাঙতি কই পামু?'

'আমি কি জানি — কোথায় পাবে?'

ছেলেটা পাঁচশ' টাকার নোট, এক হাত থেকে অন্য হাতে নিচ্ছে। ঝকঝকে নতুন একটা নোট। নোট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার হয়ত ভাল লাগছে।

'কি আশ্চর্য! হা করে দাঁড়িয়ে আছি কেন? বাকি টাকা ফেরত দে।'

'ভাঙতি নাই আম্মা।'

'ভাঙতি নাই। ভাঙতি জোগাড় কর। গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকলে — ভাঙতি কি আকাশ থেকে আসবে? যা ভাঙ্গতি নিয়ে আয়।'

মনজুর লক্ষ্য করলেন, ভদ্রমহিলা তুমি করে শুরু করেছিলেন এখন তুই তুই করছেন। তুইয়ের নীচেও আরেকটা বাক্য ধারা থাকলে মন্দ হত না।

নীতু বাবার হাত ধরে বিরক্ত গলায় বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না বাবা। চল, অন্য কোথাও যাই।

'কোথায় যাবি?'

'মাঠের ঐ পাশে যে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে চল সেখানে যাই।'

'গাড়ি ছেড়ে বেশি দূরে যাওয়া ঠিক হবে না মা। যে কোন মুহূর্তে হয়ত অল ক্লিয়ার দিয়ে দেবে।'

'দিক না। আমরা সবার শেষে যাব। আমাদের তো কোন তাড়া নেই।'

'তোর কি যেতে খুব ইচ্ছা করছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চল যাই।'

তারা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামল। কামিজ পরা একজন মহিলা প্রায় ছুটে এলেন।

'আপনারা কি বাথরুমের খুঁজে যাচ্ছেন? প্লীজ, আমাকে সঙ্গে নিন।'

'নীতু বলল, আমরা বাথরুমের খোঁজে যাচ্ছি না।'

'ও সরি।'

মহিলা যে ভাবে দৌড়ে এসেছিলেন, ঠিক সে ভাবেই দৌড়ে চলে গেলেন।

ক্ষেতের আল ধরে দু'জন এগুচ্ছে। প্রথম নীতু, নীতুর পেছনে পেছনে মনজুর সাহেব। কিছুদূর গিয়েই নীতু থমকে দাঁড়াল। লাজুক গলায় বলল, আমরা ঐ বাড়ি পর্যন্ত যাব না। এই গাছটার নিচে দাঁড়াব।

'আচ্ছা বেশ তো!'

'এটা কি গাছ বাবা ?'

'এর নাম সজনে গাছ। আচ্ছা, তুই কি আমাকে কিছু বলার জন্যে এখানে আলাদা করে নিয়ে এলি ?'

'হ্যাঁ।'

'বল্ কি বলবি ?'

' মা যে তোমার সঙ্গে আর থাকবে না, তাকি তোমাকে বলেছে ?'

'হ্যাঁ বলেছে।'

'কবে বলল ?'

'আজ।'

'আমি তাই ভেবেছিলাম।'

মনজুর সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, নীতুর মুখ থেকে একটা মেঘ যেন সরে গেল। যেন এখন সে আনন্দিত। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে মানুষ যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেও যেন তা-ই ফেলেছে। মনজুর সাহেব বললেন, তোর মা আলাদা থাকবে, এতে মনে হয় তুই খুশি হয়েছিস।

'হ্যাঁ বাবা, খুশি হয়েছি।'

'খুশি হবার কারণ কি মা ?'

'অনেকদিন থেকে মা কষ্ট পাচ্ছিল। আর কষ্ট পাবে না। কারণ মা'কে তুমি ভালবাস না বাবা।'

'ভালবাসি না ?'

'না।'

'কি করে বুঝলি ?'

'বোঝা যায়।

'দু'জন আলাদা হয়ে গেলে তুই কার সঙ্গে থাকবি ?'

'মা'র সঙ্গে। তোমার একজন ভাল সঙ্গী আছে। মা'র অভাবও তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি থাকবে কাজ নিয়ে। কাজ হল তোমার সঙ্গী। তুমি কাজ নিয়ে থাকবে। কিন্তু মা'র তো কোন সঙ্গী নেই। আমি ছাড়া মা'র আর কে আছে ? তুমিই বল বাবা — আমার কার সঙ্গে থাকা উচিত।'

'তোর মা'র সঙ্গেই থাকা উচিত।'

'থ্যাংকে ইউ। চল আমরা যাই।'

মনজুর সাহেব নড়লেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। নীতুর সহজ কথা বার্তায় তিনি প্রায় চমকে গেছেন। মানুষ কত দ্রুত বড় হয়। এই মেয়ে এইত সেদিন মাত্র কথা শিখল। র বলতে পারত না। যে কোন কিছু দেখলেই ছুটে এসে বলতো — 'ভূত কামল দিচ্ছে।'

রেবেকা মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভূত কামল দিচ্ছে আবার কি? বল, ভূত কামড় দিচ্ছে।

মনজুর বললেন, দিনে দুপুরে ভূত তাকে কামড়াবে কেন?

রেবেকা তৎক্ষণাৎ বলতো — তাইতো! এসব কে শেখাচ্ছে? কাজের মেয়ে গুলি শেখাচ্ছে। ভাল কিছু শেখাবে না। প্রথমেই শিখিয়েছে ভূত। মা নীতু শোন– ভূত নেই। নেই না–না–না। নেই। বুঝেছ মা?

'হুঁ।'

'বলতো ভূত নেই।'

নীতু আবার বলতো, "ভূত কামল দিচ্ছে।"

শৈশবের সেই ভূত কি নীতুকে এখনো কামড়ায়? মনজুর সাহেবের জানতে ইচ্ছা করল।

ওসি সাহেবের নাম ফরিদ উদ্দিন।

পুলিশ অফিসাররা সচরাচর রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে থাকেন। ফরিদ উদ্দিন তেমন না। তাঁকে খুব মাই ডিয়ার ধরনের মনে হয়। সবার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন দীর্ঘদিনের চেনা।

এখন তিনি ইয়াছিন মোল্লার সঙ্গে কথা বলছেন। কথা বলছেন ঘাড়ে হাত রেখে। ইয়াছিন মোল্লা জ্বর গায়েই চলে এসেছে। তার মুখ শুকনো।

'তুমি থাকতে এমন একটা ঝামেলা কী করে হয় বল তো ইয়াছিন? আরিচার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। তুমি বুঝতে পারছ না?'

ইয়াছিন মিনমিনে গলায় বলল, আমি কি করব? আমার কথা কে শুনবে?

'তোমার কথা শুনবে না মানে? একশ' বার শুনবে। তুমি বলে দেখ।'

'কি বলব?'

'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডেডবডি দু'টা তুলে নিয়ে যাও। বল যে শক্ত মামলা হবে। পাজেরো জীপ নিয়ে পালিয়ে যাবে, তা তো হবে না। হারামজাদাকে আমি জেলের ভাত না খাওয়ালে আমি ফরিদ উদ্দিন না।'

'এরা শুনবে না ফরিদ ভাই।'

'না শুনে করবে কি? ডেডবডি কতক্ষণ রাস্তায় ফেলে রাখবে? গভর্নমেন্ট তার রাস্তা খুলবে না? দরকার হলে ফোর্স চলে আসবে। পুলিশে না কুলালে — বিডিআর আসবে। আর্মি আসবে। মেরে তক্তা বানিয়ে দিবে। তুমি বুঝদার লোক। তুমি যদি না বোঝ . . .। যাও, বুঝিয়ে বল।'

'খরচ-বরচ কিছু পাওয়া গেলে দেখতাম মানানো যায় কি-না।'

'খরচ-বরচ কে দিবে? ট্রাকের ধাক্কায় কিংবা বাসের ধাক্কায় মারা গেলে ইউনিয়ন থেকে টাকা বের করে দিতাম। কোন অসুবিধা হত না। প্রাইভেট গাড়ি। বুঝতে পারছ না? যাই হোক, এই পাঁচশ' টাকা নিয়ে দাও — ডেডবডি তুলে নেয়ার খরচ।'

'মাত্র পাঁচশ'?'

'আরে বাবা, এই পাঁচশ' তো নিজের পকেট থেকে দিলাম। এ্যাকসিডেন্টের জীপ ধরা পড়ুক, কুড়ি হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ায়ে দিব। না দিলে আমার নাম ফরিদ উদ্দিন না। তুমি যাও, ছেলের বাবাকে আমার কাছে পাঠাও।'

ইয়াছিন চিন্তিত মুখে অগ্রসর হচ্ছে। ফরিদ উদ্দিন সিগারেট ধরালেন। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে না। তাঁর মন বলছে তিনি সমস্যা সামলে ফেলেছেন। কলেজ বন্ধ থাকায় তাঁর সুবিধা হয়ে গেছে। কলেজের ছেলেপুলে দল বেঁধে উপস্থিত হয়নি। ইয়াছিন মোল্লাকে পেয়ে যাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। অতি ধুরন্দর লোক । সে কোন-না-কোনভাবে সামলে দিবে।

সামলাতে না পারলে বিরাট যন্ত্রণা হবে। ফোর্স আনতে হবে। দুটার সময় খাদ্যমন্ত্রী যাবেন রংপুর। তার আগেই রাস্তা ক্লিয়ার করতে হবে। মনে হচ্ছে, পারা যাবে। গ্রামের লোক প্রচুর জড় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চুপচাপ আছে। তবে কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।

ওয়াকি টকিতে এসপি সাহেব ম্যাসেজ দিচ্ছেন — কতদূর কি হচ্ছে জানতে চাচ্ছেন। ফরিদ উদ্দিন বললেন, মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে, স্যার।

'পারবেন রাস্তা ক্লিয়ার করতে?'

'পারব স্যার।'

'ওদের কোন দাবি-দাওয়া আছে?'

'দাবি-দাওয়ার কথা কিছু বলছে না, স্যার।'

'যদি বলে আপাততঃ মেনে নিবেন।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'আমার আসার কি দরকার আছে?'

'এই মুহূর্তে নাই।'

'দরকার হলে বলবেন — আমি স্ট্যান্ডবাই আছি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'যদি কোন কারণে রোড ব্লক না সরে তাহলে ফোর্স এ্যাপ্লাই করতে হবে।'

'দরকার হবে না স্যার।'

'ভেরি গুড। একসেলেন্ট।'

ইয়াছিন মোল্লা মৃত ছেলে-মেয়ে দু'জনের বাবাকে নিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে

আড়ালে কথা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তা সম্ভব না — প্রায় শ'খানিক লোক তাদের ঘিরে ফেলেছে। ফরিদ উদ্দিন কি বলবেন অতি দ্রুত চিন্তা করছেন। কোন লাইনে কথা বললে ভাল হবে বুঝতে পারছেন না।

ফরিদ উদ্দিন বললেন, ভাই আপনার নাম?

'শমসের। আমার নাম শমসের।'

'আপনি কেমন লোক বলেন তো দেখি, দু'টা দুধের শিশুকে একা ছেড়ে দিয়েছেন?'

শমসের কাঁদতে শুরু করল। ফরিদ উদ্দিন মনে মনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। বাবাকে অপরাধী করা হয়েছে। রাগের কিছু অংশ বাবার উপর এনে ফেলে দেয়া হয়েছে।

'আপনি তো জানেন — পাগলের মত স্পীড দিয়ে এই রাস্তায় গাড়ি যায়। ড্রাইভারগুলি মানুষকে মানুষ মনে করে না। তারপরও কি মনে করে ছোট দু'টা বাচ্চাকে একা একা রাস্তা পার হতে দিলেন? আপনি কোথায় ছিলেন?'

শমসের জবাব দিল না। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। অন্য একজন চাপা গলায় কি যেন বলল। ফরিদ উদ্দিন ভেতরে ভেতরে চমকালেন। কারণ এইসব ক্ষেত্রে চাপা গলার কথা বা ফিসফিস কথা ভয়াবহ হতে পারে ।

'কে কথা বললেন?'

'জ্বি আমি।'

'আপনি কে? নাম কি?'

'আমার নাম ইসমাইল। আমি ড্রাইভার। মাইক্রোবাসের ড্রাইভার।'

'গাড়ির ড্রাইভার হয়ে এমন সময় কথা বলতে আসছেন — আপনার সাহস তো কম না। ড্রাইভাররা কেউ কোন কথা বলবেন না। ড্রাইভারদের সঙ্গে আমার কোন কথা নাই। আপনারা সব এক পদের। সুযোগ পেলেই মানুষ মারবেন। যান, আপনি আপনার গাড়িতে যান। যান বললাম।'

ইসমাইল গাড়ির দিকে রওনা হল। ফরিদ উদ্দিন খুব তৃপ্তি বোধ করলেন। জনতার উপর এক ধরনের প্রভাব ফেলা হয়েছে। এই প্রভাবের মূল্য অনেক। তিনি শমসেরের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, দু'টা লাশ সড়কের মাঝখানে ফেলে রেখে আপনি যে কাণ্ডটা করছেন — বাপ হয়ে এটা কি করা উচিত? এদের বাড়িতে নিয়ে যান। গোসল দেন। আল্লাহ খোদাকে ডাকেন। রোদের মধ্যে লাশ ফেলে রেখেছেন — এটা কি? কত বড় গুনাহ্‌র কাজ করছেন আপনি জানেন না?'

'বাড়িতে নিয়া যাব?'

'অবশ্যই বাড়িতে নিয়ে যাবেন। আর বাড়িতেই থাকবেন। বাড়ি থেকে বের হবেন না। এসপি সাহেব আসবেন। থানায় কেইস দিয়েছেন?'

'জ্বে না।'

'থানায় কেইস দিতে হবে। আপনার থানায় আসার দরকার নাই। আমি সেকেন্ড অফিসারকে পাঠাব। কেইস হয়ে যাক — দেখবেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাজেরো জীপের হারামজাদাকে ধরে আনব। প্রথমে হারামজাদাকে কানে ধরে একশ'বার উঠবোস করাব। তারপর অন্য কথা। মসজিদ আছে আশেপাশে? কথা বলেন না কেন, মসজিদ আছে?'

'জ্বি স্যার, আছে।'

'মসজিদ থেকে খাটিয়া আনার ব্যবস্থা করেন। ডেডবডি সরাতে হবে।'

কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। এটা শুভ লক্ষণ। একজন কেউ প্রতিবাদ করলেই অবস্থা অন্য রকম হবে। ফরিদ উদ্দিন ঘড়ি দেখলেন — এগারোটার মত বাজে। গাড়ির যে জট লেগেছে — তা দূর করতে ঘণ্টা দুই লাগবে।

ফরিদ উদ্দিন আরেকটা সিগারেট ধরালেন। তিনি যুদ্ধজয়ের আনন্দ বোধ করছেন। এতবড় সমস্যার এত দ্রুত সমাধান হবে তিনি নিজেও ভাবেননি।

তিনি ওয়াকি টকিতে খবর পাঠালেন। এসপি সাহেব বললেন, গুড, ভেরি গুড। গাড়ি কি চলতে শুরু করেছে?

'এখনো না। দশ মিনিটের মধ্যে শুরু হবে।'

'ভেরি গুড। গুড জব।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার।'

ফরিদ উদ্দিন ওয়াকি টকি বন্ধ করে চারদিকে তাকালেন। তাঁকে ঘিরে ভিড় হয়ে আছে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, ভিড় করবেন না। আপনারা যাত্রী যারা আছেন দয়া করে গাড়িতে বসুন। কুইক, কুইক।

লাল টাই-পরা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ফরিদ উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি পুলিশ অফিসার?

'জ্বি স্যার।'

'সামান্য রোড ব্লক দূর করতে আপনাদের এতক্ষণ লাগছে, এর কারণ কি। করেন কি আপনারা?'

ফরিদ উদ্দিন মুখ হাসি-হাসি রাখার চেষ্টা করলেন। তবে মনে মনে বললেন,

হারামজাদা।

'সম্পূর্ণ অকারণে আমরা এতক্ষণ এখানে পড়ে আছি।'

'এক্ষুণি অল ক্লিয়ার হবে, স্যার।'

'বিনা অপরাধে শাস্তি। আমরা যে এখানে পড়ে আছি — আমাদের অপরাধটা কোথায়? বলুন আপনি — কি অপরাধ আমাদের? এই দেশে জন্মেছি। এটাই কি অপরাধ?'

ফরিদ উদ্দিন মনে মনে বললেন, আরে শুওরের বাচ্চা, গাড়িতে গিয়ে উঠে বস্। প্যাচাল পারিস না। এত অল্পতে যে উদ্ধার পেলি এর জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দে। আমার পায়ের ধুলা নিয়ে মাথায় মাখ।

'কি, কথা বলছেন না কেন? বলুন, আমাদের অপরাধটা কি? আপনাকে বলতে হবে — 'ইউ গট টু সে।'

ফরিদ উদ্দিন আবার বললেন, গাড়িতে গিয়ে বসুন, স্যার।

'গাড়িতে বসাবসি পরে হবে। ইউ আনসার মি। আপনি তো পুলিশের লোক?'

'জ্বি স্যার। আগেও একবার আপনাকে বলেছি।'

'পোস্ট কি?'

'ওসি।'

'শুনুন ওসি সাহেব। পুলিশের লোক হিসেবে আপনি বলুন, ঘুস খাওয়া ছাড়া আর কোন্ কাজটা আপনারা ভালমত পারেন?'

ফরিদ উদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চারদিকে তাকালেন। লোকটাকে কড়া ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেয়া যায় — তবে লোকটা কে জানা নেই। হয়ত বড় কেউ। ইস্টাবলিশমেন্ট বিভাগের সেক্রেটারি, কিংবা মন্ত্রীর কোন আত্মীয়। ধমক দিয়ে শেষে কোন বিপদে পড়েন কে জানে।

ফরিদ উদ্দিন শান্ত গলায় বললেন, আপনি স্যার অকারণে রাগ করছেন। গাড়িতে উঠে বসুন। এক্ষুণি রাস্তা ক্লিয়ার হচ্ছে।

'আমি আমার প্রশ্নের জবাব না নিয়ে গাড়িতে উঠব না। **I want an answer,**

'কোন্ প্রশ্নের জবাব চাচ্ছেন?'

'আমি জানতে চাচ্ছি কোন্ অপরাধে আমাদের এখানে আটকে রাখা হল? আছে আমাদের কোন অপরাধ?'

'জ্বি-না, স্যার।'

মনজুর সাহেব গভীর আগ্রহ নিয়ে এদের কথা শুনছেন। ওসি সাহেবের কথা বার্তায় তিনি মুগ্ধ। এমন ঠাণ্ডা মাথা পুলিশদের মধ্যে দেখা যায় না। বেচারাকে আকারণে অপমান করা হচ্ছে। বেচারাকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করছে।

মনজুর সাহেব লাল টাই পরা মানুষটির দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বললেন, আমাদের অপরাধ আছে। অবশ্যই আছে।

'কি অপরাধ?'

'একটা বাচ্চা মারা গেছে। আরেকজন আহত হয়ে পড়েছিল। একের পর এক গাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেল কেউ থামেনি। কেউ আহত মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করেনি।

'যারা করেনি সেটা তাদের ব্যাপার।'

'আমাদেরও ব্যাপার। আমরাও একই জিনিস করতাম।'

'আপনি হয়ত করতেন।'

'আপনিও করতেন। কয়েক ঘন্টা আটকে আছেন বলে আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। অথচ দু'টা বাচ্চা মারা গেছে।'

'আপনি কে?'

'আমিও আপনার মতই একজন।'

ফরিদ উদ্দিন অস্থির হয়ে পড়েছেন। — দু'জনের কথাবার্তা এই মুহূর্তে বন্ধ হওয়া দরকার। সামান্য কথাবার্তা থেকে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। একত্র হওয়া একদল মানুষের মত ভয়ংকর আর কিছুই নেই। এরা বারুদ। আগুনের একটা ফুলকি পড়লেই আর দেখতে হবে না। আগুনের ফুলকি থাকে সামান্য কথা বার্তায়।

ফরিদ উদ্দিন মনজুর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার, আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন।

লাল-টাই মুখ বিকৃত করে বলল, উনি গাড়িতে গিয়ে বসলে চলবে [illegible] মানবতাবাদী — উনি থাকবেন। বাচ্চাদের নামাজে জানাজায় শরিক হবেন।

'আমার তো মনে হয় — আমাদের সবারই থাকা উচিত। অপরাধের প্রায়শ্চিত্যের দায়িত্ব অস্বীকার করা কি ঠিক? এতবড় একটা ঘটনা অথচ আমাদের মধ্যে তার কোন ছাপ নেই। বেশ কিছু গাড়িতে ক্যাসেট বাজছে। গান শোনা হচ্ছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বের হয়ে এল। তার পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জী। সে তীব্র গলায় বলল, এই ব্যাটা লাল টাই! চুপ থাক্ কইলাম। এক চড় দিয়া সিধা কইরা ফেলামু।

লাল-টাই হতভম্ব হয়ে বলল, কি বলছে, কে এই লোক! তুমি কে? who are you?

'আমি তোর তালুই।'

'এর মানে কি?'

'মানে তোর বাফেরে গিয়া জিগা। হারামীর পুত!'

প্রচণ্ড চড়ের শব্দ হল। ফরিদ উদ্দিন দেখলেন — লাল-টাই রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। লুঙ্গি এবং গেঞ্জি গায়ের লোকটি থু করে একদলা থুথু ফেলে বলল, কোন গাড়ি চলবে না। গাড়ি 'বন'। সব গাড়ি 'বন'।

ভিড়ের সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল — গাড়ি বন। গাড়ি বন!

ফরিদ উদ্দিনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। পুরো ব্যাপারটা এখন তার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

লাল টাই পরা মানুষটা উঠে বসতে যাচ্ছে। লুঙ্গি পরা লোকটা হুংকার দিয় উঠল — খবর্দার, উঠবি না। খবর্দার কইলাম। জানে মাইরা ফেলামু। শুইয়া থাক।

ফরিদ উদ্দিন লাল টাই পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, শুয়ে থাকুন। নড়া চড়া করবেন না। প্লীজ।

ফরিদ উদ্দিন আরেকটি সিগারেট বের করলেন। রোদ বাড়ছে। ঝকঝক করছে আকাশ। রোদ আরো বাড়বে। তিনি ঘড়ি দেখলেন। খাদ্যমন্ত্রী যাবেন। তার আগে কি রাস্তা পরিস্কার হবে?

লাল টাই পরা লোকটা শুয়ে আছে। সে ভয় পেয়েছে — কি অদ্ভুত চোখেই না তাকাচ্ছে। পশুরা এ রকম করে তাকায়। সে আরেকবার উঠে বসার চেষ্টা করল। লুঙ্গি পরা মানুষটা বলল, খবর্দার কইলাম, খবর্দার।

মনজুর সাহেব বললেন, উনি কেন রাস্তায় শুয়ে থাকবেন? এটা ঠিক না।

লুঙ্গি পরা মানুষটি কঠিন গলায় বলল — আপনেও চুপ থাকেন। ভদ্দরলোকের কোন দরকার নাই।

ভিড়ের ভেতর থেকে চাপা আওয়াজ উঠল — দরকার নাই। ভদ্দরলোকের দরকার নাই।

বিপদ একা আসে না। নানাদিক থেকে একসঙ্গে আসে। ফরিদ উদ্দিনের ওয়াকি টকি কাজ করছে না। বোতাম টিপলেই ঝিঁঝিঁ পোকার মত একটা আওয়াজ হয়। ব্যাটারি কি ডাউন হয়ে গেছে? ফরিদ উদ্দিন চারদিকে তাকালেন। কিছু কিছু চেনা

মুখ দেখা যাচ্ছে। একজন হল — বুড্ডা, টঙ্গীর বুড্ডা। হারামজাদা চলে এসেছে তাহলে। কোন সুযোগ এ ছাড়ে না। একটা ঝামেলা পাকিয়ে সে লুটপাটের চেষ্টা করবে। বুড্ডা একা এসেছে, না দলবল সঙ্গে এনেছে?

ফরিদ উদ্দিন বুড্ডাকে ইশারা করলেন। বুড্ডার সঙ্গে আড়ালে কিছু কথা বলা দরকার। বুড্ডা তেলতেলে মুখে হাসছে।

'কেমন আছিস বুড্ডা?'

'জ্বে ওসি সাহেব, ভাল। আপনের শইল কেমন?'

'আমার শরীর ভাল। আমি একটা বিপদে পড়েছি বুড্ডা।'

'বিপদ বলে বিপদ। এইখানে আইজ গজব হইব। পাবলিক গেছে উল্টাইয়া।'

'এখনো উল্টায়নি তবে উল্টাবে। কি করা যায় বল তো বুড্ডা?'

'আপনে আর কি করবেন? বাড়িতে গিয়া ঘুমান।'

'মিনিস্টার সাহেব রংপুর যাবেন — রাস্তা ক্লিয়ার হওয়া দরকার।'

'এইটা ভুইল্যা যান।'

'তুই কি একা এসেছিস, না তোর সঙ্গে লোকজন আছে?'

'আমি একলাই আছি। আল্লার কসম ওসি সাব। আমার সাথে আর কেউ নাই।'

'তুই এসেছিস কেন?'

'মজা দেখতে আসছি।'

'তুই আমাকে একটু সাহায্য কর বুড্ডা।'

'ছিঃ ছিঃ এইটা কি কন। আমি কি সাহায্য করব।'

'নে সিগারেট নে।'

'সিগারেট ছাইড়া দিছি ওসি সাহেব। বুকে দরদ হয়।'

'তোর সাথে আর কেউ নেইতো?'

'আল্লাহ্‌র কসম। নবী করিমের কসম। আমি একলা।'

ফরিদ উদ্দিন কোন ভরসা পাচ্ছে না।

ফরিদ উদ্দিনের কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। আকাশে চিল উড়ছে। এ কী বিপদ!

রেবেকা হাত ইশারা করে জহিরকে ডাকলেন। জহির গাড়িতে উঠে এল। রেবেকা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, হৈ-চৈ হচ্ছে কিসের?

নীতু একটা রেন্টি গাছের নিচে বসে আছে। তাকে খানিকটা ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকে তাদের মাইক্রোবাস দেখা যায়। মাঝে মাঝে সে তার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। রেবেকা চোখ বন্ধ করে আছেন বলে কিছুই জানতে পারছেন না। জহির দাঁড়িয়ে আছেন নীতুর সামনে। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। যদিও উদ্বেগ চাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। পুরোপুরি চাপা দিতে পারছেন না। তাঁর মন বলছে, ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে।

নীতু ডাকল, চাচা!

জহির কোমল গলায় বললেন, কী মা!

'বাচ্চা দু'টির নাম জেনেছেন?'

'না।'

তিনি মিথ্যা করে 'না' বললেন, কারণ ঐ বাচ্চা দু'টির প্রসঙ্গ তিনি আনতে চাচ্ছেন না। নীতু বলল, সবাই গাড়ি থেকে নামল — মা নামল না কেন?

'বোধহয় শরীর ভাল না। তোর কি খিদে পেয়েছে নীতু?'

'হুঁ।'

'খিদে পেলেও কিছু করার নেই। চুপচাপ বসে থাকতে হবে।'

'বসেই তো আছি।'

'চা পেলে খুব ভাল হত। নেক্সট টাইম আমরা কোথাও বের হলে সঙ্গে চা থাকবে। চিড়া থাকবে, মুড়ি থাকবে।'

'আপনার খিদে পেয়েছে, তাই না চাচা? খিদের সময় শুধু খাবারের কথা মনে হয়।'

'খিদে অবশ্যি পেয়েছে। বয়স হলে খিদে সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত তুই না খেয়ে থাকতে পারবি। আমি পারব না। ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে যাব।'

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন চাচা, বসুন না।'

জহির বসলেন। নীতু বলল, আপনাকে আমার অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে — শেষ পর্যন্ত সাহস হয় না।

'সাহস হয় না কেন?'

আপনি যদি মনে করেন — এই বাচ্চা মেয়ে এসব কি বলছে?
'এমন কিছু কি বলতে চাস যা বাচ্চা মেয়েদের বলা ঠিক না।'
'হ্যাঁ।'
'বলে ফ্যাল।'
'বাবাকে কি আপনি পছন্দ করেন?'
'অবশ্যই করি। তোর ধারণা হল কেন মনজুরকে আমি পছন্দ করি না?'
'আপনি বাড়িতে এলে বাবার সঙ্গে কখনো কথা বলেন না। আমার সঙ্গে এবং মা'র সঙ্গে গল্প-গুজব করে চলে যান — এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'
'তোর বাবাকে আমি খুবই পছন্দ করি।'
'কেন করেন?'
'তার চরিত্রে এমন কিছু কিছু দিক আছে যা সাধারণত দেখা যায় না।'
'উদাহরণ দিন।'
'যেমন সে কখনো মিথ্যা বলে না। আমি তাকে স্কুল জীবন থেকে দেখছি। সে মজা করার জন্যেও মিথ্যা বলে না।'
'মিথ্যা না বলতে পারাটা কি খুব বড় কিছু?'
'অনেক বড় ব্যাপার নীতু। তোর বাবা হচ্ছে কম্পুটারের মত। কম্পুটার মিথ্যা বলে না। ভুল প্রোগ্রামে চলতে পারে না। তোর বাবাও সে রকম।'
'আপনার কথায় — বাবা একটা যন্ত্র। মানুষ যন্ত্র পছন্দ করে না। আপনি কেন করেন?'
'আমি করি, কারণ আমি জানি — এই যন্ত্রটার ভেতর একজন মানুষ বাস করে। চমৎকার একজন মানুষ। আমি যেমন জানি — তুইও জানিস। জানিস না?'
'জানি।'
'প্রশ্ন শেষ হয়েছে, না বাকি আছে?'
'বাকি আছে। আর একটা প্রশ্ন। আপনি কিন্তু রাগ করতে পারবেন না। এবং কাউকে কোনদিন বলতে পারবেন না — আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করেছি।'
'আচ্ছা, শুনি তোর প্রশ্ন।'
'আপনি নিজেকি কি সত্যি কথা বলেন, না মিথ্যা বলেন?'
'আমি বেশির ভাগ সময় মিথ্যা বলি — কিন্তু তোর প্রশ্নের জবাবে সত্যি কথাই বলব।'
'কেন?'

'কারণ আমি বুঝতে পারছি — প্রশ্নটার সত্যি উত্তর জানা তোর দরকার। এর উপর হয়ত অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রশ্নটা কি?'

নীতু কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বলল, আপনি বাবাকে বেশি পছন্দ করেন, না মা'কে বেশি পছন্দ করেন?'

জহির হাসতে হাসতে বললেন, তুই খুব বুদ্ধিমতির মত প্রশ্ন করেছিস। একটি অশালীন প্রশ্ন করেছিস শালীন ভঙ্গিতে। জবাবটা এখন তোকে দেব। সত্যি জবাব। তোর মা'কে আমি পছন্দ করি না।

'কেন?'

'তোর মা মনজুরকে একটি যন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। যন্ত্রের ভেতরের মানুষটাকে বের করার কোন চেষ্টা করেনি। কাজটা জটিল নয়। সহজ কাজ। এই সহজ কাজ যে মেয়ে পারবে না — তাকে আমি পছন্দ করব কেন?'

'কাজটা সহজ ভাবছেন কেন চাচা? হয়ত কাজটা সহজ না। কঠিন কাজ।'

'খুব কঠিন বলে তো আমার মনে হয় না। তুই সেদিনের বাচ্চা মেয়ে। তুই পারিস। তুই পারলে তোর মা পারবে না কেন?'

'আমি পারি?'

'হ্যাঁ, তুই পারিস। তোর বাবার আমাদের সঙ্গে বেড়াতে আসার কোনই কারণ ছিল না। কোন পরিকল্পনাও ছিল না। তুই কিছু একটা করেছিস — যাতে সঙ্গে সঙ্গে সে রওনা হয়েছে। তোর মা এটা পারে না।'

'দোষটা হয়ত বাবার। বাবা হয়ত মা'র কাছে যন্ত্র হিসেবেই থাকতে চান।'

'তাও হতে পারে।'

নীতু থেমে থেমে বলল, বাবা যে কত ভাল এটা কেউ জানে না।

'আমি জানি। যারা তার সঙ্গে মিশেছে তারা জানে। তোদের ড্রাইভার ইসমাইল জানে। তোর বাবা যদি এখন ইসমাইলকে বলে — ইসমাইল একটা চলন্ত ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড় — সে সঙ্গে সঙ্গে তাই করবে। করবে না?'

'হ্যাঁ করবে।'

'তোর বাবার চরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে তোর মা কেন জানবে না?'

'আপনি মা'কে কখনো বলেছেন এসব?'

'না।'

'কেন বলেননি?'

'আমার উপদেশ দিতে ভাল লাগে না। তাছাড়া আমি হলাম জিপসি। জিপসিরা

উপদেশ দেয় না।'

'জিপসিরা কী করে।'

'তারা শুধু শুনে এবং দেখে। প্রশ্ন শেষ হয়েছে, না আরো কিছু আছে?'

'আরো আছে। আর মাত্র একটা। দি লাস্ট ওয়ান।'

'বলে ফেল।'

'বাবা আপনাকে বেশি পছন্দ করতেন — না জোছনা চাচিকে বেশি পছন্দ করতেন?'

'সেটা তো মা আমার জানার কথা না — তোর বাবার জানার কথা। তাকেই জিজ্ঞেস কর।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারব না।'

'আমার কি মনে হয় জানিস? আমার মনে হয় খটকা যখন লেগেছে তখন জিজ্ঞেস করাই ভাল। তোর বাবা সত্যি জবাব দেবে। সে মিথ্যা বলে না।'

'তাহলে আপনি একটু বাবাকে ডেকে দিন।'

'প্রশ্ন করার জন্যে এটা কি খুব ভাল সময় মা? চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে।'

'আমার তো মনে হয় চাচা এটাই সবচে' ভাল সময়। দুঃসময়ে আপনা-আপনি অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে আমার কিছু জটিল কথা ছিল। তা বলে ফেলেছি। আরো কিছু বলব। যাতে সব **Crystal clear** হয়ে যায়। আপনি বাবাকে খুঁজে এনে দিন।'

'আচ্ছা দিচ্ছি। তুই বরং গাড়িতে উঠে বোস — অবস্থা আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছে না।'

'আমি গাড়িতে বসতে পারব না। অসহ্য গরম।'

'তাহলে তোর মা'কে ডেকে আন।'

নীতু মা'কে ডাকতে গিয়ে দেখল, তিনি কাঁদছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। নীতু ডাকল, মা!

রেবেকা মুখ তুলে সহজ গলায় বললেন, কি?

'নিচে আস মা। গাছের নিচে বস। ভাল লাগবে। বাতাস আছে।'

রেবেকা বললেন, না।

তিনি আবার রুমালে মুখ ঢাকলেন। তাঁর শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

জহির মনজুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাচ্ছেন না। পাজেরো জীপটার পাশ দিয়ে

যাবার সময় সানগ্লাস পরা যুবক আবার মাথা বের করে বলল, স্যার, লেটেস্ট খবর কি? এনি ডেভেলপমেন্ট।

জহির থমকে দাঁড়ালেন। এই ছেলেটি তাঁকে নিয়ে এক ধরনের মজা করছে। মজার ধরনটা তিনি জানেন না। তিনি লক্ষ্য করছেন — গাড়িতে বসে থাকা তিনজন তরুণীর মুখেই চাপা হাসি।

জহির বললেন, আমার কাছে কোন খবর নেই।

'সে কি! আপনি নিগোসিয়েশন টেবিলে নেই?'

জহির জবাব দিলেন না। তরুণী তিনজন আর হাসি চেপে রাখতে পারছে না। পেছনের দু'জনের একজন মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিল। তিনি এগিয়ে গেলেন। হাসির শব্দ শুনতে শুনতে তিনি এগুচ্ছেন। তাঁকে নিয়ে এরা কি রসিকতা করে তাঁর জানতে ইচ্ছা করছে।

সানগ্লাস পরা যুবকের নাম মোরশেদ। সে জহিরের নাম দিয়েছে 'মিস্টার গাধু।' গাধার মত গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটে বলেই গাধু। মোরশেদ রসিক মানুষ হিসেবে বন্ধুমহলে পরিচিত নয়। আজ এই তিন তরুণীর মধুর সঙ্গে তার রসবোধের দরজা-জানালা খুলে গেছে। জহির চোখের আড়াল হতেই মোরশেদ বলল, গাধু বাবাজি কেমন চোখ পিট পিট করছিল দেখেছ?

তরুণী একজন বলল, চোখ পিটপিট করছিল? লক্ষ্য করিনি তো।'

'শুধু যে চোখ পিটপিট করছিল তা-না। লেজও নাড়ছিল।'

'লেজ নাড়াচ্ছিল?'

'অদৃশ্য লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। হা-হা-হা।'

সবাই হাসিতে যোগ দিল। তিন তরুণীর একজন বলল, মোরশেদ তোমার পায়ে পড়ি, আর হাসিও না।

'পায়ে পড়লে হবে না। আমার লেজে পড়। লেজে পড়লে কনসিডার করতে পারি।'

'হা হা হা।'

'হো হো হো।'

'হি হি হি।'

'আমার বড্ড হাসছি। লোকজন কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।'

'তাকাক না। আমরা হাসব এবং লেজ নাড়ব।'

'হা হা হা।'

'হি হি হি।'

বুড্ডার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। রোগা-লম্বা মানুষ। ঝকঝকে চোখের তারা। হাঁটে খানিকটা কুঁজো হয়ে। বুড্ডা এখানে উপস্থিত হয়েছে ঘণ্টাখানিক আগে। এই এক ঘণ্টায় সে খোঁজখবর করেছে। অবস্থা বিবেচনা করেছে। বড় কোন কাজ বিবেচনা ছাড়া করা যায় না। এখানকার কাজটা বড়। শুধু বড় না — বেশ বড়। এখান থেকে ফায়দা তুলতে পারলে মোটা ধরনের ফায়দা তোলা যাবে। তবে সমস্যা একটাই — সে একা। তার সঙ্গে দলবল নেই। শুধু ছোটেন থাকলেও হত। ছোটেনও নেই। ওসি সাহেবকে সে মিথ্যা বলেনি। আসলেই সে একা। এত বড় ব্যাপার সামাল দেয়া তার একার পক্ষে কষ্ট — তবু চেষ্টা করতে হবে। এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে দেয়া যায় না। ইশ্, শুধু যদি ছোটেন থাকত! তবে খবর পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ ঝামেলাটা ধরে রাখতে পারলে — ছোটেন এসে পড়বে।

আন্দোলন হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে হবে। সেটা খুব জটিল হবে না। ওসি ফরিদ উদ্দিন বাগড়া দিতে পারে। এই লোকটিও ধুরন্ধর। সমানে সমান। বুড্ডা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে লাশ দু'টির পাশে ঝিম ধরে বসে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা নাটক করবে। নাটকের ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার। ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

খাটিয়া চলে এসেছে। লাশ খাটিয়ায় তোলা হবে। মসজিদের ইমাম সাহেবও সঙ্গে আছেন। তিনি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। বিড়বিড় করে কি যেন পড়লেন — কোন দোয়া হবে। তারপর এগিয়ে এলেন লাশ তোলার জন্যে। বুড্ডা বলল, কি করেন?

ইমাম সাহেব থমকে গেলেন।

বুড্ডা বলল, লাশে হাত দিবেন না।

ইমাম সাহেব বললেন, গোর দেয়া হবে না?

'হবে, সময় হলেই হবে।'

ইমাম সাহেব আশেপাশে তাকালেন। কেউ কিছু বলল না। সবাই তাকিয়ে আছে বুড্ডার দিকে। বুড্ডা থু করে একদলা থুথু ফেলে বলল — আগে বিচার। তারপর লাশ তোলাতুলি।

বুড্ডার কথা চারদিকে চাপা আলোড়ন তুলল। বুড্ডা এবার উঠে দাঁড়াল। থমথমে গলায় বলল, আমরা বিচার চাই। এই দুই মাসুম বাচ্চার জন্য দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ।

'ঠিক বলছেন! ঠিক বলছেন!'

'যে কুত্তার বাচ্চা এই দুই মাসুমের খুন করছে তারে পুলিশ আগে ধরব — তারপর অন্য কথা।'

'সঠিক বলছেন। সঠিক বলছেন।'

বুড্ডা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, লাশ এইখান থাইক্যা সরাইয়া নিলে কিছুই হইব না। পুলিশ কিছুই করব না। বুঝছেন আপনেরা?

'বুঝছি।'

'আপনেরা কি চান বিচার হউক?'

'চাই। চাই।'

'যদি চান তা হইলে থাকেন আমার পিছে। দেখেন বিচার হয় কি-না। বলেন — আল্লাহু আকবার।'

'আল্লাহু আকবার।'

বুড্ডা তার রক্তের মধ্যে এক ধরনের কাঁপন অনুভব করছে। সে জানে এই কাঁপন অন্যরাও বোধ করছে। মানুষগুলিকে এখন একটা ঘোরের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ভয়ংকর কিছু করতে হবে। তাহলে ঘোর চলে আসবে। ভয়ংকর কি করা যায়? ভাঙচুর করা যায়। সব ক'টা গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয়া যায় — তবে এতে অনেকেই মনে করতে পারে, ব্যাপারটা উদ্দেশ্যমূলক। তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। প্রতিটি কাজ করতে হবে সাবধানে।

বুড্ডা নিচু হয়ে একটা থান ইট তুলে নিল। তার দেখাদেখি অনেকেই ইট তুলে নিল। বুড্ডা বিকট চিৎকার করল —

'নারায়ে তকবির!'

প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি হলো — আল্লাহু আকবার।

ফরিদ উদ্দিনের ওয়াকি টকি কাজ করছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে প্রচণ্ড

ভয় পেয়েছে। থানায় গিয়ে খবর দেয়া দরকার। পুলিশ ফোর্স লাগবে। মনে হচ্ছে — ঢাকা থেকে রিজার্ভ পুলিশ আনতে হবে। পিপসায় তার বুক শুকিয়ে গেছে। এক গ্লাস পানি দরকার। সঙ্গের সিগারেটও শেষ হয়ে গেছে। মোটর সাইকেলে করে সেকেন্ড অফিসারকে থানায় পাঠিয়ে দেয়া যায়। সে থাকবে। তার যাওয়া ঠিক হবে না।

ফরিদ উদ্দিন মোটর সাইকেলের দিকে গেলেন। সেকেন্ড অফিসার কবির আহম্মদ মুখ শুকনো করে মোটর সাইকেলের কাছে বসে আছে। কবির বলল, স্যার, অবস্থা তো খারাপ।

'হুঁ খারাপ। খুব খারাপ।'

'কি করব? থানায় চলে যাব?'

'হুঁ। আর্মড পুলিশ লাগবে। ম্যাজিস্ট্রেট লাগবে। গুলির হুকুম দিতে হতে পারে।'

'স্যার, বুড্ডা কি একা, না তার সাথে দলবল আছে?'

'বুঝতে পারছি না। একা বলে মনে হচ্ছে।'

বিপদের সময় কিছুই কাজ করে না। মোটর সাইকেলও স্টার্ট নিচ্ছে না। স্টার্ট নিয়ে খানিকক্ষণ ভটভট করে থেমে যায়।

ফরিদ উদ্দিন লক্ষ্য করল, বুড্ডা এগিয়ে আসছে। বুড্ডার চোখ লাল। হাতে থান ইট। পেছনে বিশাল জনতা। ফরিদ উদ্দিনের গা বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বুড্ডা বলল, ওসি সাহেব, মনে হয় পালাইয়া যাওয়ার মতলব করতেছেন।

ফরিদ উদ্দিন চুপ করে রইলেন। এখন কথা বলা অর্থহীন। বুড্ডা খনখনে গলা বলল, ওসি সাবের মোটর সাইকেল পুড়াইয়া দেও। যেন পালাইতে না পারে। বিচার না হওয়া পর্যন্ত যাওয়া-যাওয়ি নাই।

মোটর সাইকেলে আগুন দিয়ে দেয়া হল। কালো ধোঁয়া উঠছে। বুড্ডা ইট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনের মানুষদের মধ্যে ঘোর তৈরি করার জন্যে এই কাজটা দরকার ছিল। সবাই জানুক, সে কোন কিছুরই পরোয়া করে না।

বুড্ডা বলল, আসেন দেখি আপনারা, আসেন আমার সাথে।

সবাই ছুটছে বুড্ডার পেছনে। বুড্ডার পরিকল্পনা হল — রাস্তার দুই দিকই আটকে দিতে হবে। গাছ কেটে রাস্তায় ফেলতে হবে। ট্রাক এনে আড়াআড়ি রেখে চাকার হাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। রাস্তার মাঝখানে বাস এনে উল্টে ফেলে দিতে হবে। রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে চট করে পুলিশ এসে উপস্থিত হবে না। সময় পাওয়া

যাবে। ইতিমধ্যে ছোটন এসে পড়বে। ছোটন এসে উপস্থিত হলে আর চিন্তা করার কিছু থাকবে না। চিন্তার দায়দায়িত্ব ছোটন নিয়ে নিবে।

ফরিদ উদ্দিন লক্ষ্য করলেন, সেকেণ্ড অফিসার কবিরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক। অল্প বয়স। এত বড় ঝামেলায় এর আগে নিশ্চয়ই পরে নি। এই ঝামেলা কতদূর গড়াবে কেউ জানে না। মৃত্যু চোখের সামনে দোল খাচ্ছে। বুড্ডা যদি বলে বসে — মার পুলিশ মার। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। বুড্ডা কি এত বড় ভুল করবে? বুড্ডা প্রফেশন্যাল। প্রফেশন্যালরা ভুল করেনা। ফরিদ উদ্দিন চোখের ইশারায় কবিরকে শান্ত থাকতে বললেন। হঠাৎ উঠে যেন দৌড়াতে শুরু না করে।

'শুনুন, আপনি ওসি না? পুলিশের লোক না?'

পুলিশের পরিচয় ফরিদ উদ্দিন এখন গোপন রাখতে চান। তার এখন যা করণীয় তা হচ্ছে দ্রুত সরে পড়া। অবিশ্বাস্য ঝামেলা এখন বাঁধবে। এই ঝামেলা তাঁর আটকানোর পথ নেই। একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা — যদি নেতৃত্বের হাত বদল হয়। আরেকজন কেউ বুড্ডাকে চ্যালেন্জ করে নেতৃত্ব নিতে আসে। সেই সম্ভাবনা কতটুকু তিনি বুঝতে পারছেন না। চেষ্টা নেয়া যায়। তাতেও সময় লাগবে। সেই সময় কি তাঁর হাতে আছে?

'কথা বলছেন না কেন? আপনি ওসি না?'

ফরিদ উদ্দিন মহিলার দিকে তাকালেন। বিপুল আকৃতি। রোজ কতটা করে মাছ–মাংস খেয়ে এই চেহারা বানিয়েছে কে জানে। ফরিদ উদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ।

'ডাবওয়ালাকে দেখেছেন? শুকনামত একটা ছেলে। পাঁচশ' টাকার একটা নোট দিয়েছিলাম। নিয়ে সটকে পড়েছে। বলেছে ভাঙতি নিয়ে আসবে।'

'ও।'

'ও মানে কি? আপনি ও বলে ছেড়ে দেবেন? পুলিশ হয়েছেন কি জন্যে? 'ও' বলার জন্যে? খুঁজে বের করুন হারামজাদাকে — এই লোকেলিটির কেউ হবে। আমি মিসেস মেহফুজ। আমার হাসবেন্ড হলেন . . .'

হাসবেন্ড কে তা শোনা গেল না। হৈচৈ–এ চাপা পড়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটল।

ভদ্রমহিলা বললেন, কিসের শব্দ হল? টায়ার ব্রাস্ট করেছে না-কি?

'বুঝতে পারছি না। বোমাও হতে পারে।'

'আপনি গাছের মত দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনাকে কি বললাম? লোকটাকে খুঁজে বের করুন। খালি গা — পরনে সবুজ লুঙ্গি। শুনুন আমি হচ্ছি মিসেস মেহফুজ আমার হাসবেণ্ড হলেন . . .

'আচ্ছা।'

ফরিদ উদ্দিন এগুচ্ছেন। বোমার শব্দে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন — বুড্ডার লোকজন চলে এসেছে। তার প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে। ডাবওয়ালার কথায় পানির পিপাসা আরো বেড়েছে। একটা ডাব খেতে পারলে হত।

মোরশেদ শীষ দিচ্ছে। তার পাশে বসা তরুণী বলল, এই শব্দ হল কিসের? বোমা না-কি?

'হয় বোমা, নয় পটকা। দাঁড়াও, মিস্টার গাধু আসুক, তাকে জিজ্ঞেস করব।'

'শোন, আমার ভয়-ভয় লাগছে।'

মোরশেদ গুনগুন করে গাইল — নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়।

পেছনের তরুণীদের একজন বলল, ভুল সুর, ভুল কথা।

মোরশেদ সঙ্গে সঙ্গে কথা উল্টে দিয়ে গাইল —

'নাই নাই জয়, হবে হবে ভয়।'

তিন তরুণী আবার হেসে উঠল। এর মধ্যে দেখা গেল জহির যাচ্ছে। তারা সবাই গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করল। মোরশেদ গম্ভীর মুখে বলল, স্যার কোথায় যাচ্ছেন?

'আমাকে বলছেন?'

'জ্বি স্যার।'

জহির কি বলবেন ভেবে পেলেন না। ওরা তাকে নিয়ে এক ধরনের মজা করছে। প্রচণ্ড বিপদেও এরা মজা খুঁজে পাচ্ছে। সেই মজা তিনি যোগান দিচ্ছেন। তাঁর চেহারায় তাঁর চাল চলনে কমিক কিছু আগে তা তিনি আগে কখনো বুঝতে পারেন নি। আশ্চর্য ঘটনা তো বটেই!

'আমি কোথায় যাচ্ছি জানতে চাচ্ছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'কোথায়ও না। বাচ্চা দু'টির ডেডবডির কি অবস্থা দেখতে যাচ্ছি।'

'শব্দ কিসের হল?'

জহির বললেন, জানি না। হয়ত বোমার শব্দ।

মোরশেদ গলার স্বর আরো গম্ভীর করে বলল, স্যার, আমার ধারণা বোমা না।

অন্য কিছু। মনে হয় কেউ একজন পাদ দিয়েছে।

জহির হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ ধরনের কথা কেউ একজন তাঁকে বলতে পারে এই ধরণাই তাঁর ছিল না। মেয়ে তিনটাও হকচকিয়ে গেছে। তবে তা সাময়িক। তারা হাসতে শুরু করেছে।

প্রচণ্ড হাসির শব্দে পাজেরো জীপ পর্যন্ত কাঁপতে শুরু করেছে।

জহির এগিয়ে গেলেন। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

·

ডেডবডি দু'টির কাছে এখন কেউ নেই। দু'টি মৃতদেহই কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। অল্প কিছু লাল লাল বড় বড় পিঁপড়ে ঘোরাফেরা করছে —। এরা খবর নিতে এসেছে। বিশাল পিপিলিকা বাহিনী অপেক্ষা করছে। খবর পাওয়া মাত্রই তারা ছুটে আসবে।

জহির কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিঁপড়া দেখলেন — ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। পাজেরো জীপের পাশ দিয়ে তাঁকে যেতে হবে। সানগ্লাস পরা ছেলেটি আবারো হয়ত কিছু বলবে। এবার সে কি বলবে?

'ভাই, একটু শুনুন।'

জহির তাকালেন। কালো রঙের ছোট্ট একটা মরিস মাইনর গাড়ির ভেতর থেকে হাত ইশারা করে একজন মহিলা তাঁকে ডাকছেন।

আমার হাসবেন্ড অনেকক্ষণ হয়েছে গেছেন — এখনো ফিরে আসছেন না। ড্রাইভারকে পাঠিয়েছিলাম, সেও আসছে না। আমার ছেলেটা খুব ভয় পাচ্ছে। ওর হার্টের অসুখ আছে — ভয় পেলে ওর প্রচণ্ড সমস্যা হয়।

আট-ন' বছরের বাচ্চা ছেলে। মার কোলে শুয়ে আছে। খুব ঘামছে। মুখ নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

জহির বললেন, খোকা, কোন ভয় নেই। আমি তোমার বাবাকে খুঁজে বের করছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি ভিড়ের মধ্যে ওকে চিনবেন না। আপনি এখানে থাকুন। আমার খোকা কেমন জানি করছে।

'পানি দিয়ে ওর মুখটা মুছিয়ে দিন।'

'পানি নেই। বোতলের পানি সব শেষ হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, আমি পানি নিয়ে আসছি। এক্ষুণি আসছি।'

'পানি আনতে হবে না। প্লীজ আপনি এখানে থাকুন।'

"আমি যাব আর আসব। গোলমাল পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত ছেলের পাশ থেকে নড়ব না।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'খোকা তুমি হাসতো। বিপদের সময় ছেলেদের শক্ত হতে হয়। তুমি তোমরা মা'কে সাহস দাও। পারবে না?'

'পারব।'

'মাকে বল — কোন ভয় নেই। মা'কে সাহস দাও। এই ফাঁকে আমি পানি নিয়ে আসছি।

জহির ছুটে চলে গেলেন। খোকা মা'র দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, উনাকে আমি কি ডাকব মা? চাচা ডাকব?

'না উনাকে মামা ডাকবে। আমি মনে মনে তাঁকে ভাই ডেকেছি।'

'তোমার কি ভয় করছে মা?'

'করছে।'

'আমার করছে না।'

নীতু বলল, কি হচ্ছে বাবা?

মনজুর সাহেব বললেন, মনে হচ্ছে আমরা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে গেছি।

'এখন কি হবে?'

'দেখি কি হয়। তোর কি ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়ের কিছু নেই।'

'আমি কি গাড়িতে গিয়ে বসব, বাবা?'

'না। ওরা গাড়ি ভাঙচুর করতে পারে। গাড়িতে না বসাই ভাল।'

'ওরা এখন গেছে কোথায়?'

'রাস্তা আটকাতে গেছে।'

'এরকম করছে কেন?'

'মানুষ ক্ষেপে গেলে কি করে সে নিজেও জানে না।'

'তোমার কি ভয় লাগছে না, বাবা?'

'নিজের জন্যে লাগছে না। তোর জন্যে আর তোর মা'র জন্যে লাগছে।'

'তোমার কি ধারণা ভয়ংকর কিছু ঘটবে?'

'ঘটতেও পারে। একটা লোককে দেখছি সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। তার মতলব ভাল না। বদ মতলবে ক্ষেপাচ্ছে — কাজেই ভয়ংকর কিছু ঘটতে পারে।'

নীতু বলল, বাবা তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মনজুর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, রাগ করব কেন?

'এই যে আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছি — না আনলে তো তুমি এই সমস্যায় পড়তে না।'

মনজুর শব্দ করে হাসলেন। মনে হল এত আনন্দের হাসি তিনি অনেকদিন হাসেননি। নীতু খুবই অবাক হল — এমন পরিস্থিতিতেও কেউ-একজন হাসতে

পারে — সে চিন্তাও করতে পারছে না।

মনজুর বললেন, জহির কোথায়?

'জানি না কোথায়। আমি উনাকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে খুঁজে আনতে। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম।'

'কি প্রশ্ন?'

'এখন থাক বাবা। এখন আর কোন প্রশ্ন-ট্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে না।'

'এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। বরং চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে ভুলে থাকার চেষ্টা কর।'

'ভুলে থাকতে পারছি না, বাবা। খুব ভয় লাগছে।'

'কি করলে তোর ভয় কাটবে?'

'তুমি আমার হাত ধরে থাক। হাত ধরে থাকলে ভয় কমবে।'

মনজুর মেয়ের হাত ধরলেন। লক্ষ্য করলেন, মেয়ে অল্প অল্প কাঁপছে। নীতু বলল, বাবা, তুমি মা'কে ডেকে নিচে নিয়ে আস। মা'ও নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে।

'আমি ডাকলে তোর মা আসবে না।'

'তবু তুমি ডাক। মা খুব কাঁদছিল বাবা। একা একা গাড়িতে বসে কাঁদছিল।'

'একা একা কাঁদাই তো ভাল। দলবল নিয়ে কাঁদা যায় না-কি?'

'তুমি মা'কে নিয়ে আস, বাবা।'

'আচ্ছা দেখি ডেকে।'

'বাবা প্রশ্নটা করেই ফেলি। তুমি কি জোছনা চাচীর প্রেমে পড়েছিলে?'

মনজুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হঁ্যা। আর কিছু বলবি?

'না।'

মনজুর স্ত্রীকে ডাকার জন্যে গাড়িতে উঠলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বললেন, রেবেকা!

'কি।'

'খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। তোমার কাছে কি চকলেট আছে?'

রেবেকা চকলেটের প্যাকেট বের করলেন।

'পানির বোতলটা দাও।'

রেবেকা পানির বোতল এগিয়ে দিলেন।

'পানি কি এইটুকুই, না আরো আছে?'

'আরো আছে। তুমি খাও।'

মনজুর তৃষ্ণার্তের মত পানি শেষ করলেন।

'রেবেকা।'

'হুঁ।'

'তুমি নিচে গিয়ে মেয়ের পাশে দাঁড়াও। ও ভয় পাচ্ছে।'

'আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'গাড়ি থেকে নিচে নামা দরকার। এরা গাড়ি ভাঙচুর করবে বলে আমার ধারণা।'

'করুক ভাঙচুর।'

'নীতু খুব ভয় পাচ্ছে। তুমি হাত ধরে ওর পাশে দাঁড়ালে ও সাহস পাবে।'

'তুমি দাঁড়ালেই সাহস পাবে। তুমি দাঁড়িয়ে থাক।'

'আমি দাঁড়াতে পারব না। আমাকে ঐ লোকটার এনকাউন্টার করতে হবে?'

'কার এনকাউন্টার করতে হবে?'

'নাম হচ্ছে বুড্ডা। বদ লোক বলে মনে হচ্ছে — সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। ভয়ংকর কিছু যদি ঘটে ওর জন্যেই ঘটবে।'

রেবেকা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ভয়ংকর কিছু ঘটলে ঘটবে। তোমার কি দায়িত্ব?

'আমার দায়িত্ব আছে। এক অর্থে সমস্যার শুরু আমি করেছি। সব মিটেই গিয়েছিল। লাল টাই-পরা এক লোকের সঙ্গে হঠাৎ কিছু কথাবার্তা হল

'তোমার প্রয়োজন ছিল কি কথা বলার?'

'হ্যাঁ ছিল। আমাদের সবারই দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। মা হিসেবে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে নীতুর পাশে দাঁড়ানো।'

রেবেকা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, স্বামী হিসেবে তোমার কি কোন দায়িত্ব ছিল না? তুমি কি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ? রাতের পর রাত আমার ঘুম হত না। তুমি কি কখনো তার কারণ জানতে চেয়েছ?

'না।'

'তুমি বন্ধু-পত্নীকে নিয়ে জোছনা দেখার জন্যে ছাদে উঠে বসে থাকতে। জোছনা কি আমি দেখতে পারি না? আমার কি ইচ্ছা করে না তোমার হাত ধরে জোছনা দেখতে?'

'রেবেকা, তোমার মেয়েটা একা নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'

'থাকুক। একা দাঁড়িয়ে অভ্যাস হোক। কে জানে তাকেও হয়ত আমার মত একা একা জীবন কাটিতে হতে পারে।'

রেবেকা কাঁদতে শুরু করেছেন। শব্দ করে বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদছেন।

মনজুর স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলেন। রেবেকা আরো শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

আরেকটা বোমা ফাটল। মনজুর তাঁর কালো ব্যাগ খুলতে শুরু করলেন। তিনি এখন তাঁর নীল কোটটা গায়ে দেবেন। কারণ তাঁর মন বলছে — সময় হাতে বেশি নেই। জহিরের সিক্সথ সেন্সের চেয়ে তাঁর নিজের সিক্সথ সেন্স অনেক প্রবল। এই তথ্য জহির জানে না। রেবেকা কান্না থামিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এই গরমে কোট গায়ে দিচ্ছ কেন?

'এম্নি।'

'না এম্নি না। অকারণে তুমি কিছু কর না। তোমার কোটের পকেটে কি আছে?'

'একটা রিভলবার আছে।'

'তোমার উদ্দেশ্যটা কি, তুমি কি করতে চাও?'

'ঐ লোকটাকে আটকাতে হবে। ও ভয়ংকর কিছু করবে।'

'ও যা ইচ্ছা করুক।'

রেবেকা শক্ত করে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন। এমন কঠিনভাবে ধরলেন যে, মনজুরের হাত ব্যথা করতে লাগল। বুড়া ফিরে আসছে। তার পেছনে বিশাল জনতা। সবাই দৌড়াচ্ছে। তারা রাস্তার এক মাথায় দৌড়াচ্ছে। এখন যাচ্ছে অন্য মাথায়।

মনজুর স্ত্রীর হাত ধরে নিচে নেমে এলেন। নীতু থর থর করে কাঁপছে। মনজুর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এত ভয় করলে পৃথিবীতে টিকতে পারবি না। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি কি ভয় পাচ্ছি?

'না।'

'তাহলে তুই কেন পাচ্ছিস?'

'বুঝতে পারছি না, বাবা — আমার মনে হচ্ছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।'

'রেবেকা, তুমি তোমার মেয়েকে শক্ত করে ধরে থাক।'

নীতু বলল, জহির চাচা কোথায় বাবা?

'আছে কোথাও। যথাসময়ে সে উপস্থিত হবে।'

জহির ছেলেটির মুখে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। খুব কাছেই বিকট শব্দ হল। জহির বললেন, খোকা, ভয় নেই। এই দেখ, আমি তোমার হাত ধরে আছি।

'আব্বু কোথায়?'

'আব্বু আসবে। এক্ষুণি আসবে। তোমার কি ভয় লাগছে?'

'না।'

'বাহ্ এইত সাহসী ছেলের মত কথা।'

বুড্ডার ভাগ্য অসম্ভব ভাল। ছোটন চলে এসেছে। একা আসেনি, সঙ্গে আরো দু'জনকে এনেছে। চিন্তা-ভাবনার দায়-দায়িত্ব এখন ছোটনের। বুড্ডার আর কোন দায়িত্ব নেই। ছোটন এসেই হাল ধরেছে। ঠিক করেছে, আটকে পড়া গাড়ি থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে ধরে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। হোস্টেজ। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এদের ছাড়া হবে না।

বেছে বেছে গাড়ির কিছু ড্রাইভার সরাতে হবে। মেয়েছেলেদের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। মেয়েছেলের গায়ে হাত পরলে পাবলিক উল্টা ক্ষেপে যাবে। ছোটনের আবার এই দোষ আছে — মেয়েছেলের বুকে হাত দেয়া। ছোটনকে সাবধান করে দিতে হবে।

ভাল বুদ্ধি। এরচে' ভাল বুদ্ধি আর কিছু হয় না। ছোটন গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়িতে করে এদের সরিয়ে ফেলা হবে। মালদার সব পার্টি। এমন পার্টি যেন হেসে-খেলে এক লাখ দিয়ে দিতে পারে।

কাজ সারতে হবে দ্রুত। পুলিশ এসে ঘিরে ফেলার আগেই।

বুড্ডা ছোটনের সঙ্গে কানে কানে কি যেন বলল। তারপর ইট হাতে ছুটতে লাগল। তার সঙ্গে শ'দুই মানুষ ছুটছে। প্রত্যেকের হাতে ইট।

বুড্ডা বলল, ভাঙ দেখি, গাড়ি ভাঙ। বড়লোকের গাড়ি সব শেষ করে দাও।

'নাড়ায়ে তকবির।'

'আল্লাহু আকবার।'

ঝন ঝন শব্দে কাঁচ ভাঙছে। এক একজন উত্তেজনায় প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি ভাঙায় এত আনন্দ!

জহির বললেন, আসুন, আমরা গাড়ি থেকে নেমে যাই — ওরা গাড়ি ভাঙছে। খোকাকে আমার কোলে দিন।

ভদ্র মহিলা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, দেখুন আমার খোকা যেন কেমন করছে।

'আপনি কোন রকম ভয় পাবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা, তুমি শক্ত করে আমাকে ধরে রাখ।'

খোকা শক্ত করে জহিরের গলা জড়িয়ে ধরল।

'তোমার নাম কি খোকা?'

'আবীর।'

'বাহ্, কি সুন্দর নাম। আবীর। আবীর, তোমার কি ভয় করছে?'

'না।'

'এইতো সাহসী ছেলে।'

জহিরের বয়স হয়েছে। আবীরকে কোলে নিয়ে হাঁটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। হোক কষ্ট, এই ছেলেটিকে ভাল করে তুলতে হবে। নীতুদের কথা এই মুহূর্তে না ভাবলেও হবে। নীতুর পাশে তার বাবা আছে। ইস্পাতের মত মানুষ। নীতুর এখন তাঁকে দরকার নেই —।

'আবীর তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস টু।'

কাছেই আরেকটা বোমা ফাটল। আবীর শক্ত করে জহিরের গলা জড়িয়ে ধরল।

'ভয় লাগছে আবীর?'

'লাগছে।'

বোমার একটা টুকরা কি তাঁর গায়ে লেগেছে। তিনি হাঁটতে পারছে না। ছেলেটা কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে।

নীতু বলল, ভয় লাগছে বাবা। আমার ভয় লাগছে।

মনজুর মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সেই হাসিতে নীতু কোন ভরসা পেল না। তার ভয় আরো বেড়ে গেল। কারণ তার কাছে মনে হচ্ছে, বাবা অন্য রকম করে হাসছে। বাবা এরকম করে কখনো হাসে না।

ইসমাইল বলল, স্যার আমি কি দেখব, গারামের কোন ঘর বাড়িতে আম্মা আর আফারে রাখন যায় কি না মনজুর বললেন, দেখ।

ইসমাইল দৌড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল।

স্যারকে একা রেখে সে যেতে পারছে না।

রেবেকা বললেন, আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। যা হবার এখানেই হবে। মনজুর বললেন, রেবেকা শোন, আমার ব্যাপারে তোমার মনে কিছু প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলি দূর করা দরকার।

রেবেকা বললেন, এখন কোন কিছুই দূর করতে হবে না। পরে বললেও হবে।

'পরে বলার সুযোগ নাও পেতে পারি। তাছাড়া এখন একটা অদ্ভুত সময়। এই সময়ের একটা বিশেষ আবেদন আছে। শোন রেবেকা, জহিরের স্ত্রী এবং আমাকে নিয়ে তোমার মনে নানান সংশয় আছে।'

'তুমি চুপ কর। আমি শুনতে চাচ্ছি না।'

নীতু বলল, মা'র শোনা দরকার বাবা, তুমি বল।

মনজুর সাহেব স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ জন্মায় যাদের কাছাকাছি গেলে মনে পবিত্র ভাব হয়। মীরা ছিল তেমন একজন মেয়ে। যারা তার কাছাকাছি গিয়েছে তাদেরই সে বদলে দিয়েছে। জহিরকে দেখ — স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কোন মেয়ের দিকে ফিরে তাকায়নি। মীরা পৃথিবীতে এসেছিল অল্প আয়ু নিয়ে। অল্প আয়ুর প্রতিটি মুহূর্ত সে কাজে লাগিয়েছে। আমি তার কাছে ছুটে ছুটে যেতাম, কারণ, আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। চাকরি

নেই, সহায় নেই, বাবা-মা নেই। ভয়াবহ দুঃসময়! আমি এমন হতাশ হয়েছিলাম যে, একবার ঠিক করলাম কোন একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়ব। যাঁরা আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। আরো শুনতে চাও?

রেবেকা বললেন, না আর শুনতে চাচ্ছি না।

'আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম কি-না জানি না। হয়ত পড়েছিলাম। সেটা ভয়ংকর কোন অপরাধ না।'

'বলছিতো আমি আর কিছু শুনতে চাচ্ছি না। তুমি আমার পাশে থাক। খবর্দার নড়বে না।'

মনজুর হাসতে হাসতে বললেন, তুমি এত শক্ত করে আমার হাত ধরে আছ কেন? রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

'হোক বন্ধ। আমি ছাড়ব না। ছাড়লেই তুমি ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে।'

'ঝামেলা থেকে দূরে থাকা ঝামেলা এড়ানোর কোন পথ না।'

'বক্তৃতা দিতে হবে না। তুমি দাঁড়িয়ে থাক।'

ছোটেন পাজেরো জীপ থেকে কালো চশমা পরা যুবকটিকে টেনে নামাচ্ছে। তার মুখ রক্তাক্ত। কাঁচ ভাঙার সময় কাচের টুকরা এসে লেগেছে তার মুখে। গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে। গাড়িতে বসে থাকা মেয়ে তিনটি মূর্তির মত বসে আছে, কোন শব্দ করছে না। ছোটেন বলল, মাগী লইয়া ফূর্তি করতে বাইর হইছস। হারামজাদা।

ছোটেন একটি মেয়ের ব্লাউজ খামচে ধরল। বুড্ডা তাকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে কিন্তু কিছু মানে থাকে না। সুন্দর সুন্দর মেয়ে — হাত নিশপিশ করে। এই যে ছোটেন মেয়েটার বুক কচলে দিল। মেয়েটা কিছুই বলল না। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। গণ্ডগোলের এটাই মজা। অন্য সময় এই কাজের জন্যে তাকে লোকজন পিটিয়েই মেরে ফেলত। ছোটেন আরেকবার মেয়েটির দিকে হাত বাড়াল। এখন এদিকে কেউ তাকাচ্ছে না। সবাই তাকিয়ে আছে কালো চশমা ওয়ালার দিকে। তাকে মারা হচ্ছে। সবারই অংশ গ্রহণের সুযোগ আছে। এই ফাঁকে ছোটেন তিনটি মেয়ের বুকই ছুঁয়ে দেখতে পারে। সহজে এমন সুযোগ পাওয়া যায় না। বুকে হাত দেয়ার পর মেয়েগুলির মুখ কেমন বদলে যায়। এটা দেখতেও ভাল লাগে।

এমন ভয়ংকর ঘটনা যেখানে ঘটছে তার অল্প একটু দূরেই স্থূলকায়া মহিলা টাকা গুনছেন। ডাবওয়ালা ভাঙতি টাকা নিয়ে ফিরে এসেছে। ভদ্রমহিলা গজ গজ করছেন, রাজ্যের ময়লা নোট নিয়ে এসেছিস। এই নোট চলবে?

বুড্ডা এগুচ্ছে মনজুর সাহেবের মাইক্রোবাসের দিকে। ইসমাইল দুই হাত উঁচু করে ওদের আটকাল। সে বলল, মানুষ দোষ করে। গাড়ি দোষ করে না। গাড়িতে হাত দিয়েন না। খর্বদার কইলাম। খর্বদার।

বুড্ডা লাথি দিয়ে ইসমাইলকে ফেলে দিল। ইসমাইলের গলা থেকে জান্তব শব্দ বের হয়ে এল। বুড্ডা ইট দিয়ে তার মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মনজুর সাহেব দূর থেকে দৃশ্যটা দেখলেন। তাঁর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, রেবেকা, আমার হাত ছাড়। আমাকে যেতে হবে।

রেবেকা বললেন, না।

নীতু বলল, মা, বাবাকে ছেড়ে দাও। বাবা যাক।

মনজুর সাহেব এগুচ্ছেন। নীতু তার মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। নীতু বলল, আমি যে আমার বাবাকে কতটা ভালবাসি তা কি তুমি জান মা?'

রেবেকা বললেন, জানি।

রেবেকার চোখ ঝাপসা। তিনি সেই ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখছেন — যন্ত্রের মত একজন মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে যন্ত্র নয়। অসম্ভব সুন্দর একজন মানুষ যে লুকিয়ে থাকে যন্ত্রের আড়ালে। হঠাৎ হঠাৎ বের হয়ে আসে।

মনজুর সাহেব বুড্ডার সামনে এসে দাঁড়ালেন। যন্ত্রের মত গলায় বললেন — স্টপ।

তিনি কোটের ভেতরের পকেটে হাত দিলেন। আর ঠিক তখন তাঁর মনে পড়ল — অনেক অনেক দিন আগে তেঁতুলিয়ায় কোন্‌ দৃশ্যটি দেখেছিলেন। জোছনা রাতে তাঁরা বসেছিলেন খোলা প্রান্তরে। আর তাঁদের মাথার উপর দিয়ে এক সঙ্গে উড়ে গিয়েছিল শত শত শীতের পাখি। তারা খানিকক্ষণের জন্যে চাঁদের আলো ঢেকে ফেলেছিল। আহা কি অপূর্ব দৃশ্য! এই দৃশ্য এতদিন কি করে ভুলেছিলেন? তিনি মনে মনে বললেন, যদি বেঁচে থাকি তাহলে রেবেকাকে ঐ দৃশ্য দেখাতে নিয়ে যাব। অবশ্যই নিয়ে যাব।

মনজুর সাহেব রিভলবার বের করলেন। বুড্ডাকে লক্ষ্য করে পর পর দু'টি গুলি করলেন। ছোটন তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। তিনি রিভলবারে ট্রিগার চেপে ছোটনের জন্য অপেক্ষা করছেন।